গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)

প্রশিক্ষণ মডিউল- মাছের পোনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	কোর্সের সিডিউল/সময়সূচী	০২
	কোর্সের সার্বিক উদ্দেশ্য	০৩
	প্রকল্প পরিচিতি	০৪
১.	নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা	০৫
১.১	নার্সারী ব্যবস্থাপনা	০৫
১.২	নার্সারী পুকুরের বৈশিষ্ট্য	০৭
১.৩	রেনু পোনার পরিচিতি	০৭
১.৪	ভালো ও খারাপ পোনা চেনার উপায়	০৮
১.৫	পোনা মাছের খাদ্যাভ্যাস	১০
২.	পোনা মাছ চাষের জন্য পুকুরে মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা	১০
২.১	পুকুর প্রস্তুতিকরণ	১০
২.২	পুকুরের পাড় সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন	১২
২.৩	রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ	১৪
৩.	পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদপূর্ব অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ	১৬
৩.১	চুন প্রয়োগ	১৬
৩.২	পুকুর প্রস্তুতকালীণ সময়ে সার প্রয়োগ ঃ	১৮
৩.৩	প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা	২১
৩.৪	জলজ পোকামাকড় দমন	২২
৪.	পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ	২৩
৪.১	প্রজাতি নির্বাচন	২৩
৪.২	পোনা পরিবহণ	২৪
৪.৩	পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা	২৬
৪.৪	পোনা অভ্যস্তকরণ	২৭
৪.৫	পোনা ছাড়া	২৮
৫.	পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদকালীন ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ	২৮
৫.১	সম্পূরক খাদ্য পরিচিতি	২৮
৫.২	মজুদ কালীন অন্যান্য যত্ন ও সেবা কার্যক্রম সমূহ	৩০
৬.	পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ পরবর্তী অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ	৩০
৬.১	মজুদ-পরবর্তী সার প্রয়োগ	৩০
৬.২	মজুদপরবর্তী সাধারণ রোগ বলাই ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	৩২
৭.	পোনা চাষের জন্য পোনার পরিচর্যা, নমুনায়ন করা ও পোনা চাষের খরচের হিসাব নিকাশ রেকর্ড বুকে সংরক্ষণ করা (পোনা চাষের অর্থনীতি)	৩৪
৭.১	পোনার পরিচর্যা	৩৪
৭.২	নমুনায়ন করা ও পোনা চাষের খরচের হিসাব নিকাশ রেকর্ড বুকে সংরক্ষণ করা (পোনা চাষের অর্থনীতি)	৩৪
৮.	কার্পের ধানী পোনার চাষ	৩৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)

মাছের পোনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সিডিউল

মেয়াদ ঃ ০১ (এক) দিন
অংশগ্রহনকারী ঃ সিআইজি/বিইউজি সদস্যবৃন্দ (২৫ জন)
স্থান ঃ

অধিবেশন নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	সময়	ফ্যাসিলিটেটর
০১	• রেজিস্ট্রেশন	৯.০০-৯.৩০	এসও (ক্রপ/মৎস্য)
	• পরিচিতি • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী • হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • উদ্বোধন	৯.৩০-১০.৩০	নির্বাহী প্রকৌশলী / উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউএনও/ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/ডিটিসি/সহকারী প্রকৌশলী
	চা বিরতি	১০.৩০-১০.৪৫	
০২	• নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা,(নার্সারী পুকুরের বৈশিষ্ট্য, রেনু পোনার পরিচিতি, ভালো ও খারাপ পোনা চেনার উপায়, পোনা মাছের খাদ্যাভ্যাস)	১০.৪৫-১২.০০	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
০৩	• পোনা মাছ চাষের জন্য পুকুরে মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা (পুকুর প্রস্তুতিকরণ ,পুকুরের পাড় সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন ,রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ)	১২.০০-০১.০০	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/সিআরএমসি
	মধ্যাহ্ন ভোজ ও নামাজের বিরতি	০১.০০-২.০০	
০৪	• পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদপূর্ব অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ • পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ	২.০০-৩.০০	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
০৫	• পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদকালীন ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ, সম্পূরক খাদ্য পরিচিতি • মজুদ কালীন অন্যান্য যত্ন ও সেবা কার্যক্রম সমূহ	৩.০০-৪.০০	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
০৬	• পোনা চাষের জন্য পোনার পরিচর্যা, নমুনায়ন করা ও পোনা চাষের খরচের হিসাব নিকাশ রেকর্ড বুকে সংরক্ষণ করা (পোনা চাষের অর্থনীতি),পোনার পরিচর্যা,পোনা চাষের হিসাব নিকাশ বা অর্থনীতি • কার্পের ধানী পোনার চাষ	৪.০০-৫.০০	ডিটিসি/ইউপিসি/এসও (ক্রপ/মৎস্য)
	• সার-সংক্ষেপ আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব সমাপনী ও চা চক্র		

কোর্সের সার্বিক উদ্দেশ্য

কোর্স শেষে প্রশিক্ষনার্থীগণ ঃ

- নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা, নার্সারী পুকুরের বৈশিষ্ট্য, রেনু পোনার পরিচিতি, ভালো ও খারাপ পোনা চেনার উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

- পোনা মাছের খাদ্যাভ্যাস, পোনা মাছ চাষের জন্য পুকুরে মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা, পুকুর প্রস্তুতিকরণ,পুকুরের পাড় সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

- পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদপূর্ব অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ, চুন প্রয়োগ, পুকুর প্রস্তুতকালীণ সময়ে সার প্রয়োগ, প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা, জলজ পোকামাকড় দমন সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

- পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ, প্রজাতি নির্বাচন, পোনা পরিবহণ, পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা, মাছের প্রজাতি সংমিশ্রণ,পোনা অভ্যস্তকরণ, পোনা ছাড়া সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

- পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদকালীন ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ, সম্পূরক খাদ্য পরিচিতি, মজুদ কালীন অন্যান্য যত্ন ও সেবা কার্যক্রম সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ পরবর্তী অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ, মজুদ-পরবর্তী সার প্রয়োগ, মজুদপরবর্তী সাধারণ রোগ বলাই ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

- পোনা চাষের জন্য পোনার পরিচর্যা, নমুনায়ন করা ও পোনা চাষের খরচের হিসাব নিকাশ রেকর্ড বুকে সংরক্ষণ করা (পোনা চাষের অর্থনীতি), পোনার পরিচর্যা, পোনা চাষের হিসাব নিকাশ বা অর্থনীতি কার্পের ধানী পোনার চাষ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

প্রকল্প পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হাওরের উন্মুক্ত জলাশয় এমন একটি বিশেষ অবস্থা, যা প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবনে ব্যাপকভাবে ভোগান্তির সৃষ্টি করে। কৃষি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে জীবনযাত্রাকে চরমভাবে দুর্বিষহ করে তোলে। বছরের প্রায় ৬/৭ মাস শস্যক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন থাকে। গ্রামীন জনগণকে মৎস্য আহরণ এবং অন্যান্য off - farm (অকৃষি) কাজের শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। শুষ্ক মৌওসুমের জন্য অপর্যাপ্ত নিমজ্জিত রাস্তা সংযুক্ত করণের মাধ্যমে যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে উঠেছে এবং বর্ষার সময়ে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা বা ট্রলার। দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ উন্নতিকে নিরুৎসাহিত ও বাজার ব্যবস্থা এবং অকৃষি কাজের সুযোগকে করেছে বাঁধাগ্রস্থ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে জনগনকে। স্থলভাগে ঢেউ এর কঠিন আঘাত অনেক সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে হাওর এলাকার অনেক গ্রামের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে। গ্রামগুলোকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করা, মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য শস্য উৎপাদন ও পশুপালন হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। " হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" উপরোল্লেখিত প্রয়োজন মেটানোর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

পরিকল্পনাটি কিছু সমৃদ্ধশালী উপাদানে তৈরি যার অর্থায়নে IFAD, SPANISH TRUST FUND এবং বাংলাদেশ সরকার। এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার মূল কার্যক্রমকে উৎসাহ যোগাবে। জলমগ্ন অবস্থা বা হাওর অঞ্চলের সম্প্রদায়ের জীবনমানের উন্নয়ন ধারাকে শক্তিশালী করবে। গ্রামীণ জীবন-যাপন উন্নততর করার জন্য নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিবে।

প্রকল্প এলাকা এবং অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীঃ

প্রকল্পটি পাঁচটি হাওরযুক্ত জেলায় বাস্তবায়ন হবে। নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮ টি উপজেলায় প্রকল্পটি ২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।। প্রকল্পটি মূলতঃ সুবিধা দিবে ১) হাওরের জলমগ্ন এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারসমূহকে। ২) ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার যাদের ২.৫ একরের নীচে জমি রয়েছে। ৩) ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি পরিবার যাদের আয়ের বড় অংশ আসে মৎস্য আহরণ থেকে। ৪) দরিদ্র পরিবারের নারী সদস্যদের এবং ৫) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বাজারের স্থানীয় প্রতিনিধিদের।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

প্রকল্পের লক্ষ্য হলো হাওরের জলমগ্ন এলাকার জনগনের দারিদ্রতা হ্রাসে সহায়তা করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের দুর্ভোগ কমিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ।

১) বাজারে প্রবেশাধিকার। জীবিকা নির্বাহের সুযোগ এবং সামাজিক সেবা নিশ্চিতকরণে উৎসাহিতকরণ।

২) গ্রামের গতিশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদনে ক্ষতি হ্রাস এবং আবহাওয়ার চরম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ

৩) মৎস্য সম্পদ আহরণে অভিগম্যতা, আলোচনার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করা এবং হাওর অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

৪) উৎপাদন বহুমুখীকরণ, শস্য এবং পশু সম্পদ বাজার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিতকরণ।

৫) কার্যকরী, যুক্তিসঙ্গত ও মিতব্যয়ীতার মাধ্যমে প্রকল্পের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১।নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা

১.১ নার্সারি ব্যবস্থাপনা ঃ

মাছের রেণু কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যত্ন সহকারে লালন-পালন করে মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযোগী চারা পোনা উৎপন্ন করার পদ্ধতিকে নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলা হয় ।

নার্সারি ব্যবস্থাপনার গুরু ত্ব ঃ

সময়ের সাথে সাথে গ্রামে-গঞ্জে মাছ চাষের ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য চাষী/নার্সারি অপারেটরগণ উন্নততর পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফল লাভের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যথাসময়ে সঠিক আকার ও কাঙ্খিত প্রজাতির সুস্থ, সবল উন্নত মানের পোনার দুস্প্রাপ্যতা মাছ চাষে ভালো ফল লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মানসম্পন্ন পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে নার্সারি স্থাপন অপরিহার্য ।

আমাদের দেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমানে রেণু উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া নদ-নদী থেকেও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত রেণু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণ রেণু উৎপাদন বা সংগ্রহ করা হয় তা শতকরা ৩০ ভাগও বাঁচানো সম্ভব হয় না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে রেণু পোনা সরাসরি মজুদ পুকুরে ছাড়লে ব্যাপকভাবে এদের মৃত্যু ঘটে। কারণ তখন এরা অত্যন্ত ছোট ও দুর্বল থাকে, রেণুর চলাফেরা গতি কম থাকায় সহজেই রাক্ষুসে মাছ ও জলজ প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়। এছাড়াও মজুদ পুকুরের অধিক গভীরতায় খাদ্য খুঁজে বের করতে পারে না পক্ষান্তরে গভীরতাজনিত পানির চাপে মারা যায়। তাই নার্সারি পুকুরে চারা পোনা তৈরী করে মজুদ পুকুরে ছাড়লে রেণু পোনার এই নাজুক পর্যায়কে সযত্নে পরিহার করা সম্ভব হয়। এ ছাড়াও নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ চাষে আরও কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন-

- সময়মত সঠিক আকারের পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির সুস্থ সবল পোনা প্রাপ্তি
- চাষের পুকুরে মজুদ ঘনত্বের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়
- আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদের সুযোগ সৃষ্টি
- মজুদ পুকুর থেকে অধিক উৎপাদনের নিশ্চয়তা

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নার্সারি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত লাভজনক। এ ক্ষেত্রে অল্প মূলধন বিনিয়োগ করে কম সময়ে তুলনামূলকভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঃ

নার্সারি পুকুরে রেণু পোনা ছাড়ার পর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির মাধ্যমে এরা সুস্থ সবল পোনায় পরিণত হতে পারে। রেণু পোনার জন্য প্রয়োজন অল্প গভীরতা বিশিষ্ট জলাশয় এবং অধিক তদারকী। রেণু পোনা বড় হওয়ার সাথে সাথে এদের প্রয়োজন পড়ে বেশি জায়গার। গভীরতাজনিত প্রভাব তখন কমে যায়, আগের মত এত নিবিড় তদারকী প্রয়োজন হয় না এবং পরিবর্তন ঘটে খাদ্যভাসে। নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনায় দেখা গেছে যে রেণু মজুদের কয়েকদিন পর পোনা কাটাই করলে অর্থাৎ মজুদ ঘনত্ব কমানোর জন্য এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করলে বৃদ্ধির হার অনেক বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পোনা চাষ অধিক লাভজনক বলে প্রমাণিত হলেও চাষীর একাধিক পুকুর না থাকলে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। তবে রুই জাতীয় মাছের চারা পোনা উৎপাদনে এক ধাপ ও দুই ধাপ উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

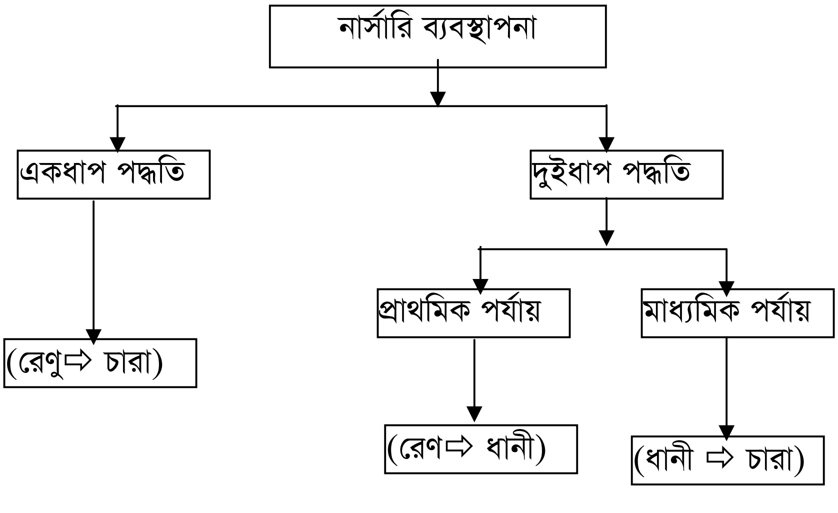

একধাপ পদ্ধতি ঃ

একই পুকুরে যখন রেণু পোনা লালন পালন করে ঐ পুকুরেই চাহিদা মাফিক আকারের চারা পোনা তৈরি করা হয় তখন তাকে একধাপ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে রেণুর মজুদ ঘনত্ব কম থাকে বলে তুলনামূলক লাভও কম।

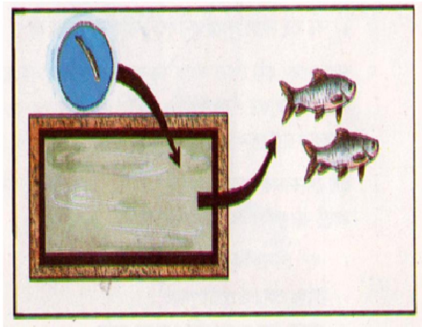

পোনা চাষের এক ধাপ পদ্ধতি

দুইধাপ পদ্ধতি ঃ

একটি পুকুরে বেশি পোনা মজুদ করে প্রথমে ধানী পর্যন্ত বড় করা হয়। তার পর ধানী পোনা অন্য পুকুরে স্থানান্তর করে চাহিদা মাফিক আকারের চারা পোনা তৈরি করা হয়। এ ধরনের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় দু'ধরনের পুকুর ব্যবহৃত হয়। আঁতুর পুকুর ও লালন পুকুর। আঁতুর পুকুরে প্রাথমিকভাবে রেণু মজুদ করে ১০-১৫ দিন লালন পালন করে অন্য পুকুরে স্থানান্তর করে সেখানেই ৩-৪ ইঞ্চি আকারের পোনা উৎপাদন করা হয়। যে সব চাষীর একাধিক পুকুর আছে তারা এ পদ্ধতিতে সফলভাবে নার্সারি করে অধিক লাভবান হতে পারেন।

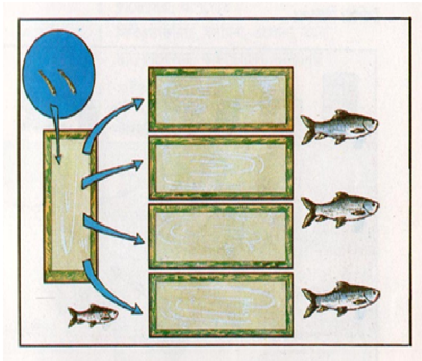

পোনা চাষের দুই ধাপ পদ্ধতি

পোনা চাষের উপকরণ ঃ

যে কোন জাতের পোনা উৎপাদন করতে বেশ কিছু উপকরণ প্রয়োজন। উপকরণ নির্বাচনের সঠিকতা এবং সহজ প্রাপ্যতা পোনা চাষে সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। সাধারণভাবে ব্যবহৃত উপকরণ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য চিত্রে দেখানো হয়েছে।

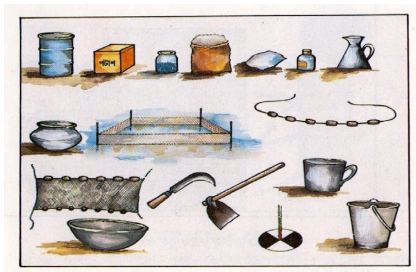

পোনা চাষের উপকরণ

নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সাধারণতঃ নিম্নে উল্লে খিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে-

১. চাষির পোনা চাষের অভিজ্ঞতা
২. চাষির মালিকানাধীন পুকুরের সংখ্যা
৩. চাষির আর্থিক সামর্থ্য
৪. চাষকৃত পোনার চাহিদা

নার্সারি ব্যবস্থাপনার সময় ঃ

বছরের কোন সময়ে নার্সারি কার্যক্রম শুরু করতে হবে তা মূলতঃ নির্ভর করে রেণু প্রাপ্তি এবং পুকুরে পানির পর্যাপ্ততার ওপর। আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রজাতির নার্সারি করা হয়ে থাকে, প্রাকৃতিক উৎস হতে বা হ্যাচারি থেকে মার্চ-এপ্রিল মাসেই এদের রেণু পাওয়া যায়। তবে মিরর কার্পের রেণু জানুয়ারী মাসেই পাওয়া যায়। সেই বিবেচনায় মিরর কার্প ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির পোনার নার্সারি মার্চ-এপ্রিল মাসেই শুরু করা হয়। সারণী-০১ এ হ্যাচারি ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন প্রজাতির রেণু প্রাপ্তির সময় উল্লেখ করা হলো-

সারণী-০১ ঃ হ্যাচারি ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন প্রজাতির রেণু প্রাপ্তির সময়

প্রজাতি	সময় (মাস)	
	প্রাকৃতিক উৎস	হ্যাচারি
রুই, কাতলা, মৃগেল	এপ্রিল-জুন	মার্চ-আগষ্ট
সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প	-	মার্চ-আগষ্ট
কমন কার্প	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	জানুয়ারী-জুলাই
পাঙ্গাস	-	মে- সেপ্টেম্বর
তেলাপিয়া	-	সারা বছর
থাই সরপুঁটি	মে-জুন	মার্চ-আগষ্ট

১.২ নার্সারী পুকুরের বৈশিষ্ট্য ঃ

যে সমস্ত পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের ২-৪ দিন বয়সের রেণু অথবা ১০-১৫ দিন বয়সের রেণু পোনা লালন-পালন করে মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযোগী চারা পোনা উৎপাদন করা হয় সেগুলোকে নার্সারি পুকুর বলে । অধিকতর লাভজনকভাবে দ্বি-স্তর পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদনে দু'ধরণের পুকুরের প্রয়োজন হয় ।

১. আঁতুর পুকুর ঃ যে সমস্ত ছোট, মাঝারী এবং অগভীর পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ১০-১৫ দিন লালন পালন করে রেণু পর্যন্ত বড় করা হয় তাদেরকে আতুঁর পুকুর বলে । এ সমস্ত পুকুরের

- আয়তন ১৫-২৫ শতাংশ এবং
- পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে ।

২. লালন পুকুরঃ যে সমস্ত পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ৭-১২ সে. মি. আকারের চারা পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাদেরকে লালন পুকুর বলে । এ সমস্ত পুকুরের

- আয়তন ২৫-১০০ শতাংশ হলে ভালো হয়
- পানির গভীরতা ১.৫-২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে ।
- আয়তাকার পুকুর, ঢাল ১ঃ২ অথবা ১ঃ১.৫
- মাটির গঠন দোআঁশ অথবা এটেল দোআঁশ
- তলায় ১০-১৫ সে. মি. বেশি পঁচা কাদা থাকবে না
- পুকুরের সব পাড় উঁচু মজবুত ও বন্যামুক্ত হতে হবে
- বাড়ীর কাছাকাছি হলে ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধা হয়
- পুকুরে প্রচুর সূর্যের আলো (প্রায় সারাদিন) এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকবে ।
- শীত বা গ্রীষ্মকালে পুকুর শুকিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই
- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী কোন গাছ বা ঝোপঝাড় পাড়ে থাকবে না
- মৌসুমী পুকুর নার্সারি ব্যবস্থাপনার জন্য ভাল
- পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহ ব্যবস্থা থাকলে ভাল ।

১.৩ রেণু পোনার পরিচিতি ঃ

পোনা চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারের পোনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা জরুরী । বিভিন্ন আকারের পোনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে পোনা ব্যবসায়ী এবং পুকুর মালিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন । নিচে বিভিন্ন আকারের পোনার বেড়ে ওঠার পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হল ।

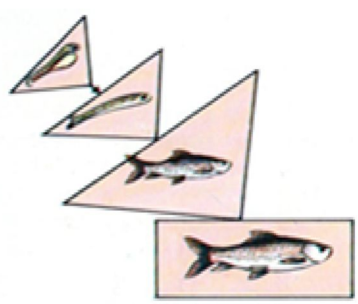

বিভিন্ন আকারের পোনা

১. রু ই জাতীয় মাছের পোনা ঃ

ডিম পোনা ঃ

- মাছের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রুণ তৈরির পর যখন তা নাড়াচড়া শুরু করে (ডিমের ভিতরে) সে ধাপকে সাধারণতঃ ডিম পোনা বলা হয় ।
- ডিম নিষিক্ত হয়ে ভ্রুণ তৈরির পর ডিম্ব-থলি দুই থেকে তিন দিন পরে মিলিয়ে যায় । এই ডিম্ব-থলি মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে ডিম পোনা বলা হয়ে থাকে ।
- ডিম্ব-থলি থাকা অবস্থায় ডিম পোনা পানি হতে খাবার গ্রহণ করে না ।
- সাধারণতঃ পাঁচ দিন পর পোনা পরিবহণ করা হয় ।
- ডিম পোনা মাছের আকার ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে ।

রেণু পোনা ঃ

- ডিম পোনার পেটের থলি মিলিয়ে যাবার পরের স্তরই হলো রেণু পোনা । রেণু পোনার দেহ লম্বাটে ও চিকন হয়ে থাকে ।
- রেণু পোনাকে সাধারণতঃ সিদ্ধ ডিমের কুসুম খাওয়ানো হয় ।
- মাছের আকার ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে রেণু পোনার আকার ছয় থেকে দশ মিলিমিটার হয়ে থাকে ।

ধানী পোনা ঃ

সাধারণতঃ ধানের আকারের পোনাকে ধানী পোনা বলা হয় ।

- জিরা ধানী- জিরা ধানী অপেক্ষাকৃত ছোট । এই আকার হতে ১০ থেকে ১২ দিন সময় লাগে ।
- ধানী- ধানী পোনা জিরা ধানী হতে একটু বড় যা হতে ১২ থেকে ১৫ দিন লাগে ।
- ধানী পোনার মধ্যে মাছের চেহারা পুরাপুরি প্রকাশ পায় । ধানী পোনার প্রধান খাদ্য হলো প্রাণিকণা বা জুপ্লাংকটন ।
- ধানী পোনার দৈর্ঘ্য এক থেকে দুই সে. মি. । রেণু পোনা হতে ধানী পোনার অবস্থায় পৌঁছাতে ১২ হতে ১৫ দিন সময় লাগে । এ অবস্থা থেকে নার্সারির দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় । এখানে পোনা কাটাই করা হয় ।

চারা পোনা বা আংগুলে পোনা ঃ

- চারা পোনা আকারে মানুষের হাতের আংগুলের সমান বলেই একে আংগুলে পোনা বলা হয়ে থাকে । মাছ চাষের জন্য চারা পোনা বা আংগুলে পোনা পুকুরে ছাড়তে হয় । সাধারণতঃ ৫ সে. মি.হতে ১৫ সে. মি. দীর্ঘ পোনাকে চারা পোনা বলা হয় ।
- চারা পোনাকে কৃত্রিম খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে । এ ছাড়াও চারা পোনার পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হয় ।
- চারা পোনার দৈর্ঘ্য ১০-১৫ সে. মি. । এ অবস্থায় সাধারণতঃ নার্সারি থেকে পুকুরে ছাড়তে হয় ।

১.৪ ভাল ও খারাপ পোনা চেনার উপায় ঃ

মাছ চাষের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়ার পূর্ব শর্ত হলো ভাল গুণগতমান সম্পন্ন পোনা মজুদ করা । এক্ষেত্রে সঠিক সংখ্যা ও আকারের মাছের পোনা পুকুরে মজুদ করতে হবে । মাছের পোনার উৎস এবং পরিচর্যা এদের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে । যে কারণে খারাপ পোনা পুকুরে মজুদ করা হলে চাষী ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে । যথাযথ মানসম্পন্ন পোনা মজুদ করা না হলেঃ

- মজুদের পর ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে
- মাছের বর্ধণ হার কম হয়
- সময়মত বাজারজাত করা যায় না

পোনা ভাল বা খারাপ হওয়ার কারণ

অন্ত ঃপ্রজনন (ইনব্রিডিং)

একই উৎস থেকে উৎপাদিত মা-বাবা, ভাই-বোন এদের মাঝে বংশ পরম্পরায় প্রজনন ঘটলে তাকে অন্তঃপ্রজনন বা ইনব্রিডিং বলে। এভাবে মাছের পোনা উৎপাদন করা হলে কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ কমে যায়। অন্তঃপ্রজননের ফলে উৎপাদিত পোনা দুর্বল, বিকলাঙ্গ হয়। এদের মৃত্যু হার বেশি ও দেহের বৃদ্ধি কম হওয়ায় আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না।

- সুস্থ সবল মাছ থেকে সুস্থ সবল পোনা পাওয়া যায়। এজন্য বড় ও সুস্থ সবল মাছ থেকে আমরা ভাল পোনা আশা করতে পারি
- সুস্থ ও সবল পোনার জন্য পোনার উৎস সম্পর্কে খোঁজ নেয়া আবশ্যক এবং দেখা উচিত
- সুস্থ সবল বাবা মা মাছকে ইনজেকশন দিয়ে পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে কিনা। (এটি হওয়া উচিৎ)
- একই উৎসের মা-বাবা, ভাই-বোন মাছের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে কিনা (এটি হওয়া উচিৎ নয়)
- প্রজাতিভিত্তিক প্রাপ্ত বয়স্ক মাছকে ইনজেকশন দিয়ে পোনা তৈরী করা হচ্ছে কিনা (এটি হওয়া উচিৎ)

অনুচিৎ কাজ করা হলে শারিরীকভাবে বিকলাঙ্গ পোনা উৎপাদনের ঝুঁকি থাকে, পোনা ব্যবসায়ীগণ এসব পোনা সংগ্রহে ও চাষীদের নিকট বিতরণ না করার ব্যাপারে সজাগ থাকবেন।

আন্তঃপ্রজনন (ক্রস ব্রিডিং) ঃ

ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে পোনা উৎপাদনকে আন্তঃপ্রজনন বা ক্রস ব্রিডিং বলে। যেমন-রুই ও মৃগেল মাছের মাঝে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা তৈরী করা।

- বর্তমানে ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।
- ক্রস ব্রিডিং- এর মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা যাতে মাছ চাষিদের নিকট না নেয়া হয় সেদিকে পোনা ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

পরিচর্যার কারণ ঃ

পোনা সংগ্রহ, পরিবহণ বা মজুদ কালে যথাযথ ভাবে পরিচর্যা করা না হলে পোনার গুণগত মান খারাপ হয়ে যায়।

সারণী-০২ ঃ রু ই জাতীয় মাছের ভাল ও খারাপ পোনার বৈশিষ্ট্য

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
চলাফেরা	চঞ্চল, সাঁতার কাটতে থাকে	ধীর-স্থির
দেহের রং	ঝকঝকে উজ্জ্বল	ফ্যাকাশে
দেহের অবস্থা	পিচ্ছিল	খসখসে
দেহে দাগ	কোন দাগ নেই	দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ দেখা যায়
লেজে ধরে চাপ দিলে	জোরে মাথা ঝাঁকায়	আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকায়
আচরণ	পাত্রে হাত দিলে দ্রুত সরে যায়	পাত্রে হাত দিলে ধীরে ধীরে সরে যায়
পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটে অথবা পাত্রের মাঝখানে জড়ো হয়।

১.৫ পোনা মাছের খাদ্যাভ্যাস ঃ

ছোট অবস্থায় রেণুর পরিপাকতন্ত্র দুর্বল ও মুখের ব্যাস ছোট থাকে। এ অবস্থায় এরা পুকুরে বিদ্যমান সব ধরনের জুপ্লাংকটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। প্রোটোজোয়া ও রটিফারের বিভিন্ন প্রজাতিই হচ্ছে এ সময়ে এদের সবচেয়ে উপযোগী খাদ্য। দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে (যেমন ধানী) এরা প্রথমে ক্লাডোসিরা এবং পরে কপিপোড জাতীয় প্রাণী-প্লাংকটন খেতে শুরু করে।

সাধারণত ঃ পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৫ দিনের মধ্যে ফাইটো প্লাংকটন, ৫-১০ দিনের মধ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসিরা এবং ১২-২০ দিনের মধ্যে কপিপোডের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। সে কারণে পোনা প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পুকুরে সার প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

পানিতে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের প্লাংকটন রেণু ও ধানীর প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে পোনা ৪০-৭০% আমিষ চাহিদা পূরণ করে থাকে। রেণু অবস্থায় সকল পোনাই খাদ্য হিসেবে প্রাণী-প্লাংকটন গ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত প্রাণী-প্লাংকটন রেণু/পোনার খাদ্য নয়।

ছোট অবস্থায় পোনার পরিপাকতন্ত্র দুর্বল ও মুখের ব্যাস ছোট থাকে।বড় আকারের প্রাণী-প্লাংকটন রেণু পোনা খেতে পারে না। প্রোটোজোয়া ও রটিফারের বিভিন্ন প্রজাতি রেণু পোনার সব চেয়ে উপযোগী খাদ্য। তাই নার্সারি পুকুরে এ ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়া উচিত।

এ ছাড়া পোনা বিভিন্ন বয়সে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। বয়স ও প্রজাতি ভেদে ময়দা, গমের ভূষি, চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিসমিল, গবাদি পশুর রক্ত, ক্ষুদিপানা, তৈরি খাদ্য ইত্যাদি সম্পুরক খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। রেণু অবস্থায় সরিষার খৈল বহুল ব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্য।

২। মাছের পোনা চাষের জন্য পুকুরে মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

২.১ পুকুর প্রস্তুতিকরণ ঃ

পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ ঃ

- মাটি ঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠের যে অংশ থেকে উদ্ভিদ খাদ্য সংগ্রহ করে তাই মাটি। পুকুরের পানি সংলগ্ন ১৫-২০ সে. মি. মাটি পানির সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে। মাটি প্রধানতঃ চারটি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। উপাদান গুলো হচ্ছে-

১. খনিজ পদার্থ	-	৪৫%
২. জৈব পদার্থ	-	০৫%
৩. বায়ু	-	২৫%
৪. পানি	-	২৫%

১. খনিজ পদার্থ ঃ

মাটির এ অংশ বালি, পলি, কাদা কণা দ্বারা গঠিত। এটাই মাটির মুখ্য উপাদান। পুকুরের মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা নির্ভর করে মাটির এই উপাদানের ওপর। যে মাটিতে অধিক পরিমাণ কাদা কণা থাকে তাকে কাদা মাটি (এটেল মাটি), যে মাটিতে অধিক পরিমাণ পলিকণা থাকে তাকে পলিমাটি এবং যে মাটিতে অধিক পরিমাণ বালিকণা থাকে তাকে বালিমাটি বলে। কাদা মাটি ও পলি মাটির (এটেল জাতীয়) পুকুরে পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বালিমাটির পুকুরের চেয়ে বেশি।

২. জৈব পদার্থ ঃ

মাটিতে সাধারণত ঃ ১-২% হারে জৈব পদার্থ থাকে তবে হিম অঞ্চলে তা ৫% পর্যন্ত পাওয়া যায়। পুকুরের তলার মাটির জৈব অংশের ওপর পুকুরের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহের অন্যতম উৎস তলার মাটি। তলার মাটির জৈব অংশের উৎস পুকুরের পাশের জমি ও প্রয়োগকৃত জৈব পদার্থ। তলার মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান পানিতে মুক্ত হওয়ার মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে মাটির ধরণ, তাপমাত্রা, গভীরতা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি এবং ব্যাকটেরিয়ার কর্মকান্ডের উপর। পুকুরের তলদেশের মাটিকে বলা হয় পুকুরের ল্যাবরেটরী/গবেষণাগার। এখানেই হাজার রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থ অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। জৈব পদার্থ পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

৩. বায়ু

বায়ু যদিও মাটির একটি অন্যতম উপাদান কিন্তু পুকুরের মাটি বলতে যা বুঝায় সে মাটিতে বায়ুর উপস্থিতি খুবই কম। জৈব-অজৈব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদিত গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া পুকুরের মাটিতে অন্য কোন গ্যাসীয় অংশ থাকে না। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট গ্যাস মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে।

৪. পানি ঃ

পুকুরের মাটি ও পানি জৈব-অজৈব ক্রিয়া বিক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান বিমুক্ত ও স্থানান্তরের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। পুকুরের উর্বরতা বা জৈব উৎপাদন নির্ভর করে পুকুরের পানির ভৌত রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। পুকুরের ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে এমন উপাদান গুলি নিম্নরূপ-

- ভৌত ঃ পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, সূর্যালোক ইত্যাদি।
- রাসায়নিক ঃ অক্সিজেন, অ্যামেনিয়া, নাইট্রাইট, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ক্ষারত্ব ও খরতা, পিএইচ, লবণাক্ততা ইত্যাদি।

- ভৌত ঃ পানির গভীরতাঃ গভীরতার কারণে সূর্যালোকের প্রভাবে পানিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি হয়। যথা-উপরের স্তর, মধ্য স্তর, নিচের স্তর ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরগুলির গভীরতা ৩-৯ ফুটের মধ্যে। উপরের স্তরই মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। নার্সারি পুকুরের গভীরতা বেশি হলে রেণু পোনা পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। পোনা মাছ অগভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নার্সারি পুকুরের গভীরতা ৩-৪.৫ ফুট হলে ভালো হয়।

তাপমাত্রাঃ প্রত্যেক প্রজাতিরই তাপমাত্রা সহনশীলতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন এবং মাছের দেহ বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। পোনা উৎপাদনে সহায়ক তাপমাত্রা ২৫-৩০$^{\circ}$সে.।

সূর্যালোক ঃ সূর্যই সকল শক্তির উৎস। সূর্যালোকের প্রাপ্ততা ও প্রখরতার উপর সালোক-সংষেশ্লণ নির্ভরশীল যা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। নার্সারি পুকুরে দৈনিক কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সূর্যালোক পড়া আবশ্যক।

- রাসায়নিক ঃ

অক্সিজেনঃ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস প্রধানতঃ দুইটি
- পানি সংলগ্ন বাতাস ও
- সালোক-সংষেশ্লণ

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, অন্যান্য গ্যাসের আংশিক চাপ বাড়ার সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। বায়ু চাপ বাড়লে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা বাড়ে। নার্সারি পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা ৩-৯ পিপিএম হলে ভাল হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইডঃ পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উৎস প্রধানত: জৈব পদার্থের পঁচন ও জলজ জীবের শ্বাস প্রশ্বাস। মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানির পিএইচ- এর মান ৪.৫ পর্যন্ত নামাতে পারে। ১২ মি. গ্রা./লি. যুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড মাছ ও জলজ জীবের জন্য ক্ষতিকর নয়।

ক্ষারত্ব ও খরতা ঃ মাছ চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। পানির ক্ষারত্ব ও খরতার মান ২০ মি.গ্রা./লি. এর কম বা খুব বেশি বেড়ে গেলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, প্রাথমিক উৎপাদন কমে যায়, সারের কার্যকারিতা কমে, মাছ সহজেই অম্লত্ব ও অন্যান্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ক্ষারত্ব ও খরতার মান ৪০-২০০ মি. গ্রা./লি. হওয়া উচিত।

পিএইচ ঃ পিএইচ হচ্ছে কোন বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের অবস্থা বুঝায় যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। ৭ দ্বারা নিরপেক্ষ মান নির্দেশিত হয়। পিএইচ এর মান ৭ এর কম হলে অম্লত্ব এবং ৭ এর বেশি হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। পোনা মাছ চাষে পিএইচ এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানির পিএইচ-এর মান ৬-৯ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভালো।

অ্যামোনিয়া ঃ পোনা মাছের বর্জ্য, অভুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন দ্রব্যের পচঁন ইত্যাদির ফলে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। যার আধিক্য মাছ চাষের জন্য ক্ষতিকর। আয়নিত ও অ-আয়নিত দু'ভাবেই অ্যামোনিয়া পানিতে থাকতে পারে। তবে প্রথমটি কম ক্ষতিকর। অ-আয়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫মি.গ্রা/লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

নাইট্রাইটঃ এটি ব্যাকটেরিয়া দহণের ফলে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইটের মধ্যবর্তী অবস্থা। পুকুরের তলার পঁচা পদার্থ বেড়ে গেলে অক্সিজেনহীন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া নাইট্রাইটে পরিণত করে। নাইট্রাইটের খুব স্বল্প মাত্রাও মাছের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। পানিতে নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ মি.গ্রা/লিটারের কম থাকা উচিৎ।

সারণী-০৩ ঃ পানির বিভিন্ন গুণাগুণের উঠানামা ও অনুকুল মাত্রা

উপাদানের নাম	উঠানামার মাত্রা (পিপিএম)	অনুকূল মাত্রা (পিপিএম)
অক্সিজেন	৪-১২	৫-৮
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	০-৯.৩	০-১৫
পিএইচ	৬-৯	৭-৮.৫
মোট ক্ষারত্ব	২১৫-৩৬৫	২০০-৫০০
ফসফেট	০.০৪-০.৩৮	-
নাইট্রেট	০.৪৩-১.৭৪	-
সালফেট	৩.৭-৯.৯	-

২.২ পুকুরের পাড় সংস্কার ও জলজ আগাছা দমন ঃ

পুকুর সংস্কার ঃ

পুকুর সংস্কার করা মাছ চাষ ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা উভয় সময়েই অত্যন্ত জরুরী। পুকুর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে-

- পাড় মেরামত
- পাড়ের ঢাল মেরামত
- তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণ
- তলদেশ সমানকরণ
- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী পাড়ের বড় গাছের ডালপালা কেটে ফেলা ও পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় পরিস্কার করা।

পাড় মেরামত ঃ

- নার্সারি পুকুরের পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে স্বাভাবিক বর্ষায় ডুবে না যায়।
- পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা শক্ত করে বেধে দিতে হবে যাতে বাইরের রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।
- পাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তা ভরে দিতে হবে যাতে বাইরের পানি চুইয়ে পাড় ভেঙ্গে ফেলতে না পারে।

পাড়ের ঢাল মেরামত ঃ

- পুকুর পাড়ের ঢাল ভাঙ্গা থাকলে বা ঢালের গায়ে গর্ত থাকলে তা মেরামত করতে হবে। তাহলে পাড় সহজে ভাঙ্গবে না।
- পাড়ের ঢাল ২:১ অনুপাতে রাখা দরকার। এতে পাড় ভেঙ্গে পড়বে না, জাল টানা সহজ হবে এবং সঠিকভাবে মাছ আহরণ করা যাবে। এছাড়া সূর্যের আলো কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়ায় প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন সহায়ক হবে।

তলার অতিরিক্ত ও পঁচা কাদা অপসারণঃ

পুকুরের তলার ৪-৬ ইঞ্চির বেশি কাঁদা থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে-

- বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে
- পোনার চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়
- সহজে হররা টানা যায় না
- অক্সিজেনের অভাব হতে পারে।

তলদেশ সমানকরণ ঃ

- তলদেশে গর্ত বা উঁচু-নিচু থাকলে সমান করে দিতে হবে। এতে জাল ও হররা টানা সহজ হয় এবং কার্যকরভাবে পোনা আহরণ সম্ভব হয়।

পাড়ের বড় গাছের ডালপালা ছাটাইকরণ ঃ

- পুকুরের পানিতে ছায়া সৃষ্টিকারী বড় গাছের ডাল-পালা কেটে ফেলতে হবে। এতে সূর্যের আলো সহজে ও কার্যকরভাবে পুকুরের পানিতে পড়বে যা প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে।

পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় পরিষ্কারকরণ ঃ

- পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করতে হবে। এতে মৎস্যভূক প্রাণী সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।
- পুকুর থেকে পুষ্টি শোষণ করে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

জলজ আগাছা দমন ঃ

পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভবে মাছের পোনার উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদেরকে জলজ আগাছা বলে। পুকুরে সাধারণত: ৩ ধরনের জলজ আগাছা ও শেওলা দেখা যায় যেমন-
ক. ভাসমান, খ. লতানো, এবং গ. নিমজ্জিত

ক. ভাসমান ঃ
যে সমস্ত আগাছা পানির উপর ভেসে থাকে তাদেরকে ভাসমান জলজ আগাছা বলে। এরা আবার দুই ধরনের হতে পারে-
১. মুক্ত ভাবে ভাসমানঃ এরা পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে, যেমন- কচুরীপানা, টোপাপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।
২. মূল মাটিতে এবং পাতা উপরে এরা মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। যেমন- শাপলা, পানি ফল ইত্যাদি।

খ. লতানো ঃ
এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের পাড়ে পানি নিচে আটকানো থাকে। কান্ড ও পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। এসব উদ্ভিদ পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে, যেমন- কলমীলতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি।

গ. নিমজ্জিত ঃ
এ ধরনের জলজ আগাছা পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে এবং পাতা বা ডাল কখনই পানির উপর আসে না। যেমন- ঝাঁঝি, কাঁটাশেওলা ইত্যাদি।

জলজ আগাছার ক্ষতিকর দিকসমূহ ঃ

সব ধরনের জলজ আগাছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ চাষে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মাছচাষের ওপর জলজ আগাছার উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়।

- পোনার সহজ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সহজে রাক্ষুসে প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়।
- শিকারী মাছ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- পুকুরে সহজে হররা টানা যায় না।
- জাল টানায় অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফলে পোনা টেকসইকরণ ও ধানী কাটাইয়ে অসুবিধা হয়।

জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১. কায়িক শ্রম পদ্ধতি ঃ
পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা, কাঁচি দিয়ে কেটে তুলে ফেলা যায়। কখনও কখনও পুকুরে দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তোলা যায়। পুকুরের তলদেশে শাপলা/শালুকের মূল যদি থাকে তবে আঁচড়া দিয়ে উপরিয়ে ফেলতে হবে।

২. জৈবিক পদ্ধতি ঃ
অনেক মাছ আছে যারা জলজ আগাছা খেয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যেমন-গ্রাস কার্প। এ ছাড়া মিরর কার্প ও কার্পিও মাছ ডুবন্ত উদ্ভিদের শিকড় তুলে ফেলে।

৩. সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ
পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশি পরিমাণে অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। যদি পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ, যেমন- নাজাজ থাকে তাহলে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মধ্যে পুকুরে সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয়। সূর্যালোক না পাওয়ার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত উদ্ভিদ (নাজাজ) মারা যায়। পুকুরে অতিরিক্ত শেওলা থাকলে কম পানিতে ০.৫ পিপিএম তুঁতে প্রয়োগ করে শেওলা দমন করা যায়। উল্লেখ্য যে , চুন দেওয়ার ৭ দিন পূর্বে তুঁতে দিতে হবে।

২.৩ রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ ঃ
নার্সারি পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ লাভজনকভাবে পোনা উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। পুকুরের এসব মাছের উপস্থিতি নানাভাবে পোনার উৎপাদনকে ব্যাহত করে, ফলে ভাল ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই রেণু মজুদের পূর্বে পুকুর হতে অবশ্যই সমস্ত রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করতে হবে।

রাক্ষুসে মাছ ঃ
যে সমস্ত মাছ অন্য মাছ/প্রাণীকে ধরে খায় তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। এরা মাছের পোনা খেয়ে ফেলে, ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, কাকিলা, বাইল্যা, টাকি/লাটি, চ্যাং, মাগুর ইত্যাদি।

অবাঞ্চিত মাছ ঃ
যে সমস্ত মাছ সরাসরি অন্য মাছকে খায় না কিন্তু মাছের পোনার সাথে খাদ্য, বাসস্থান এবং অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে অবাঞ্চিত মাছ বলে। নার্সারি পুকুরে এ ধরনের মাছ থাকলে খাদ্যের অপচয় হয় এবং সার্বিক উৎপাদন অনেক কমে যায়। যেমন- মলা, ঢেলা, চাপিলা, পুটি, চান্দা, ইচা (ছোট চিংড়ি) বইচা ইত্যাদি।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

রেণু মজুদের পূর্বে নার্সারি পুকুর থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ সরিয়ে ফেলতে হয় । কারণ-

- রাক্ষুসে মাছ সরাসরি পোনা খেয়ে ফেলে । যেমন- রাক্ষুসে মাছ ২ কেজি হতে প্রায় ১০-১২ কেজি অন্য মাছ খায় ।
- অবাঞ্চিত মাছ পোনার খাদ্য নষ্ট করে যেমন-১ কেজি অবাঞ্চিত মাছ ১০-১২ কেজি বড় মাছের খাদ্যে ভাগ বসায় ।
- পোনার সাথে বাসস্থান ও অক্সিজেন নিয়ে প্রতিযোগিতা করে ।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন পদ্ধতি ঃ

নার্সারি পুকুর হতে দুইভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যেতে পারে । যেমন-
১ । পুকুর শুকিয়ে এবং
২ । বিষ প্রয়োগ করে ।

নিচে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করার বিভিন্ন ক্ষতিসমূহ বিস্ত ারিত আলোচনা করা হলো-

১. পুকুর শুকানো ঃ
বাজে পোকা-মাকড়, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ মারার জন্য পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভাল । পাম্প ব্যবহার করে এ কাজটি করা যায় । শুকানোর পর কড়া রোদে পুকুর বেশ কদিন ফেলে রাখতে হবে যেন তলা দিয়ে হেটে গেলে পায়ের দাগ পড়ে কিন্তু পা ডুবে না যায় । এ কাজটি ফেব্রুয়ারী-মার্চে করলে খরচ ও সময় দুই'ই কম লাগে । নার্সারির ক্ষেত্রে পুকুর শুকানোই উত্তম ।

২. বিষ প্রয়োগ ঃ

পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে ঔষধ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায় । নার্সারি পুকুর হতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণের জন্য রোটেনন, চা বীজের খৈল বা তামাকের গুড়া ব্যবহার করা যেতে পারে । এ গুলোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । যেমন- রোটেনন, চা বীজের খৈল ও তামাকের গুড়া জৈব উৎস হতে উৎপন্ন ।

- এসব ঔষুধ জৈব সার হিসেবে কাজ করে
- এগুলো প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও জলজ কীট মারা যায় না
- এসব ঔষুধ মাছের ফুলকায় আক্রমণ করে ফিলামেন্ট বন্ধ করে দেয়, ফলে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় । এগুলো দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যায় ।

ব্যবহৃত ঔষুধসমূহের বিবরণ, প্রয়োগমাত্রা ও পদ্ধতি

রোটেনন পাউডার ঃ
রোটেনন হচ্ছে ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরি এক ধরনের পাউডার, যা দেখতে হালকা বাদামী রংয়ের । রোটেনন প্রয়োগে মাছ মারা যায়, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মারা যায় না ।

ব্যবহার মাত্রা ঃ
বাজারে দু'ধরণের ক্ষমতার রোটেনন পাওয়া যায়, যেমনঃ ৯.১% এবং ৭% শক্তি সম্পন্ন রোটেনন । রোটেননের মাত্রা নির্ভর করে এর শক্তির ওপর । কড়া রোদের মধ্যে পানিতে রোটেননের মাত্রা কিছুটা কম লাগে । আবার তুলনামূলক ঠান্ডা পানিতে রোটেননের মাত্রা বেশি লাগে ।

সারণী-০৪ ঃ বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রোটেননের শতাংশ প্রতি মাত্রা

শক্তি (%)	সাধারণ পরিমাপক (গ্রাম/ফুট পানি/শতক)
৯.১	১৮-২০গ্রাম
৭	২৫-৩০ গ্রাম

ব্যবহার পদ্ধতি ঃ

প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাউডার বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে 'কাই' তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাঁই তিনভাগে ভাগ করে, এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল বানাতে হবে এবং বাকী দু'ভাগ প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে তরলীকৃত করতে হবে। প্রথমে ছোট ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত অংশও পুকুরের পানিতে ছড়াতে হবে। ২০-২৫ মিনিট পর আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে।
বিষাক্ততার মেয়াদকাল ঃ প্রায় ৭ দিন।

সতর্কতা ঃ

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার পদ্ধতি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন-

- নার্সারি পুকুরে ঔষধ ব্যবহার করা হলে এলাকাগত প্রাপ্যতা, মূল্য, বিষাক্ততার মেয়াদকাল, পুকুরের সামাজিক ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রতিক্রিয়া- এ বিষয় গুলো খুব ভালভাবে বিবেচনা করতে হবে।
- পুকুর শুকনো হলে রেনু সরবরাহের সময় এবং পানির বিকল্প উৎসের (গভীর/অগভীর নলকূপ) বিবেচনায় রাখা উচিত।

৩. পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদপূর্ব অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ ঃ

৩.১ চুন প্রয়োগ ঃ

চুন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ অজৈব যৌগ যা এসিড মাধ্যমকে ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ করে।

চুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ঃ

- মাটি ও পানির pH কে মাছ চাষের উপযোগী রাখে।
- পানিতে ক্ষারত্বের পরিমাণ ২০ মি. গ্রাম./লি. এর বেশি রাখতে সহায়তা করে।
- সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে।
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবী ও রোগজীবাণু দূর করে।
- পুকুর তলায় জৈব পদার্থের পঁচন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে।
- চুনের ক্যালসিয়াম নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান।
- কাঁদায় আবদ্ধ ফসফরাস মুক্ত করে।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা ঃ

ক. হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে অর্থাৎ পানিকে নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে, ফলে প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় থাকে।
খ. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে ক্যালসিয়াম ও গুরুত্বপূর্ণ আয়ন সমূহ প্রদান করে থাকে। ক্যালসিয়াম ও সিলিকা জীবের দৈহিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে।
গ. সালোকসংশ্লেষণের জন্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সরবরাহ বাড়ায়।
ঘ. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে।
ঙ. জৈব পদার্থের পচঁন ক্রিয়া তরান্বিত করে, ফলে পানিতে পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।
চ. পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।
ছ. পানির ঘোলাত্ব দূর করে।
জ. সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে

চুনের প্রকারভেদ ঃ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায় ।
নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন ধরণের চুনের প্রাপ্যতা ও রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হলো-

সারণী-০৫ ঃ সারণীতে বিভিন্ন ধরণের চুনের প্রাপ্যতা ও রাসায়নিক গঠন

চুনের নাম	প্রাপ্যতা
পাথুরে চুন	কোন কোন বাজারে পাওয়া যায় না
পোড়া চুন	বাজারে পাওয়া যায়
কলি চুন	বাজারে পাওয়া যায়
ডলোমাইট	কোন কোন বাজারে পাওয়া যায়
জীপসাম	কোন কোন বাজারে পাওয়া যায়

চুনের মাত্রা ঃ
সাধারণভাবে প্রতি শতকে এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । চুন প্রয়োগের জন্য প্রথমেই জানতে হবে পানিতে পিএইচ এবং ক্ষারত্বের পরিমাণ । গ্রামীণ পুকুর ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে পানির অম্লত্ব/ক্ষারত্বের ওপর ।

চুনের প্রয়োগের মাত্রা ঃ

মাটির পিএইচ ও চুনের ধরনের ওপর নির্ভর করেই চুনের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত । নিম্নের সারণীতে শতাংশ প্রতি চুনের মাত্রার একটি নির্দেশনা দেয়া হল-

সারণী-০৬ ঃ শতাংশ প্রতি চুনের মাত্রার একটি নির্দেশনা

পিএইচ	পোড়া চুন	কলি চুন	পাথুরে চুন	ডলোমাইট
৩-৫	৬ কেজি	৯ কেজি	১২ কেজি	৯-১০ কেজি
৫-৬ (এটেল মাটি)	৪ কেজি	৬ কেজি	৮ কেজি	৮-৯ কেজি
৬-৭ (দো-আঁশ মাটি)	১-২ কেজি	৩ কেজি	৪ কেজি	৩-৪ কেজি

সারণী-০৭ ঃ মাটির ধরণ অনুযায়ী পোড়া চুনের প্রতি শতাংশ প্রয়োগ মাত্রা

মাটির ধরণ	নতুন পুকুর	পুরাতন পুকুর
দো-আশ	১ কেজি	২ কেজি
এটেল	৪ কেজি	৬ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

শুকনা ও ভেজা মাটির পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় চুন গুড়া করে ঢালসহ সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে । পানি ভর্তি পুকুরে প্রয়োজনীয় চুন মাটির চাড়ি বা ড্রামে গুলে ঢাল সহ সমস্ত পুকুরে পূর্বের মত সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

চুন প্রয়োগের সময় ঃ

শুকনা পুকুরে চাষ দেয়ার ১-২ দিন পর
পুকুরে পানি সেচের পর পরই ভেজা মাটিতে
পানি ভর্তি পুকুরে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন আগে ।

চুন প্রয়োগের সতর্কতা ঃ

- চুন গুলানো ও ছিটানোর সময় নাক ও মুখ গামছা দিয়ে বাঁধতে হবে
- কোন অবস্থাতেই প্লাষ্টিকের পাত্রে চুন গুলানো যাবে না
- চুনের পাত্রে পানি ঢালার আগে পাত্রের মুখ অবশ্যই চট/বস্তা দিয়ে ঢাকতে হবে
- পাত্রে চুন রেখে তার পর পানি ঢালতে হবে
- বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটাতে হবে
- চোখে চুন লাগলে সাথে সাথে তা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে ।

৩.২ পুকুর প্রস্তুতকালীণ সময়ে সার প্রয়োগ ঃ

জলজ পরিবেশে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ খাদ্যের জন্য পারস্পরিক ভাবে একে অন্যের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল । যার ফলে পুকুর সব সময়ই পুষ্টি পদার্থের একটি গতিশীল চক্রায়ন ঘটতে থাকে । পুষ্টি পদার্থের এই গতিশীল চক্রায়নই খাদ্য শিকল নামে অভিহিত । যেহেতু এই চক্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে মৃত প্রাণী বা জৈব পদার্থের পঁচনের মাধ্যমে অজৈব পুষ্টি মুক্তকরণ ।

পুকুরের পরিবেশে বিদ্যামান খাদ্য চক্রের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ফাইটোপ্লাংকটন, ব্যাকটেরিয়া, জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী- প্লাংকটন, তলদেশে ছোট পোকা-মাকড়, মাছ ইত্যাদি । এরা সকলেই উৎপাদন ও গ্রহণে সম্পৃক্ত তাই এদেরকে উৎপাদক ও গ্রাহক বলা হয় । এই উৎপাদক ও গ্রাহকসমূহ খাদ্য শিকলের তিনটি স্তরে অবস্থান করে । যেমন-

প্রথম স্তরে ঃ প্রাথমিক উৎপাদক (উদ্ভিদপ্লাংকটন, ব্যাকটেরিয়া)

দ্বিতীয় স্তরে ঃ প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাংকটন, তৃণভোজী মাছ)

তৃতীয় স্তরে ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক (প্রাণী-প্লাংকটনভোজী মাছ ও মাংসাসী প্রাণী)

খাদ্য শিকলের প্রথম স্তর শুরু হয় প্রাথমিক উৎপাদক; ফাইটো-প্লাংকটন দিয়ে । এরা সূর্যশক্তিকে অজৈব কার্বনের সাথে সংযুক্ত করে প্রটোপ্লাজম, শ্বেতসার ও অক্সিজেন তৈরি করে ।

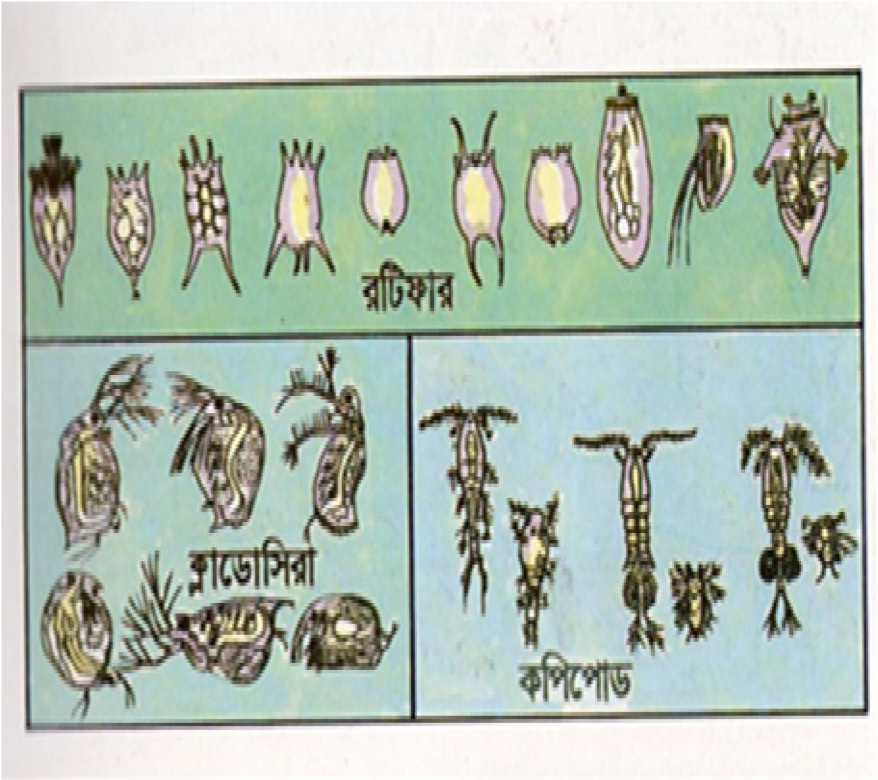

চিত্র-৫ ঃ প্রাণী -প্লাংকটন

খাদ্য শিকলের পরের স্তরে অবস্থানকারী প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাহক মূলতঃ প্রাণী-প্লাংকটন । প্রাণী প্লাংকটন খাদ্যের জন্য প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত উদ্ভিদ-প্লাংকটন ও ব্যাকটোরিয়ার ওপর নির্ভরশীল । কিছু তৃণভোজী মাছ ও এ স্তরে অবস্থান করে উদ্ভিদ-প্লাংকটন খেয়ে থাকে । একইভাবে তৃতীয় স্তরে অবস্থানকারী মাছ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ-প্লাংকটনও প্রাণী-প্লাংকটনেরওপর নির্ভরশীল থাকে যারা আবার চূড়ান্তভাবে বড় রাক্ষুসে মাছের শিকারে পরিণত হয় । অন্যদিকে পুকুরে বসবাসকারী প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃত্যুর পর উদ্ভিদ ও প্রাণী তলদেশে জমা হয় । তখন বিশেষ ধরণের কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং ফাংগাস সমস্ত বস্তুর পঁচন ঘটিয়ে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে যা পুনরায় উদ্ভিদ-প্লাংকটন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় । পঁচনকারী প্রাণীদের খায় প্রটোজোয়া, একজাতীয় কেঁচো । উল্লেখিত উদ্ভিদ-প্লাংকটন, প্রাণী-প্লাংকটন, উদ্ভিদ, প্রটোজোয়া, কেঁচো এদের সকলকে একসাথে বলে পুকুরের জৈব উৎপাদন ।

সার প্রয়োগের উদ্দেশ্যঃ

পোনামাছ- এর প্রাকৃতিক খাবার হলো প্রধানত উদ্ভিদ প্লাংকটন ও প্রানি-প্লাংকটন। প্রাণি-প্লাংকটনএর উৎপাদন নির্ভর করে উদ্ভিদ-প্লাংকটনের প্রাচুর্যতার ওপর। আর উদ্ভিদ-প্লাংকটন তাদের বাঁচার জন্য দ্রবীভূত পুষ্টির উপর নির্ভরশীল। প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার। এরা প্রটোপ্লাজমের মূল উপাদান। আমিষ এবং নিউক্লিক এসিড সংশ্লেষণে এদের প্রয়োজন। প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন উৎস হতে এই পুষ্টিসমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয় ।তবে এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যখন নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদ করা হয় তখন অধিক পরিমাণে প্লাংকটন উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সে সময় পানিতে দ্রবীভূত নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি দেখা দেয়। পুষ্টি উপাদানের এই ঘাটতি পুরণের জন্য পুকুরে বিশেষভাবে নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে ইউরিয়া এবং ফসফরাসের উৎস হিসেবে টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। এক কথায় বলা যায় পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পানিতে সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারের প্রকারভেদ ঃ

জৈব ও অজৈব দু'ধরণের সারই পুকুরে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জৈব সার ঃ

সরাসরি প্রাণী-প্লাংকটন এবং ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য হিসেবে কাজ করে। পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে উদ্ভিদ-প্লাংকটন উৎপাদনে সাহায্য করে। পুকুরে জৈব সার হিসেবে গোবর, হাঁস মুরগীর বিষ্ঠা বা কম্পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

অজৈব সার ঃ

প্রাথমিকভাবে ফাইটো-প্লাংকটন উৎপাদনে সহায়ক। অজৈব সার হিসেবে প্রধানতঃ ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করা হয়।

নিচের সারণীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফাইটো-প্লাংকটন ও জু-প্লাংকটন উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সারে বিদ্যমান নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো-

সারণী-০৮ ঃ বিভিন্ন ধরনের সারে বিদ্যমান নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ

পুষ্টি	গোবর %	মুরগির বিষ্ঠা %	হাঁসের বিষ্ঠা %	ইউরিয়া %	টিএসপি %	কম্পোস্ট %
নাইট্রোজেন	০.৬০	১.৬০	১.০	৪৩-৪৬	-	২-৩
ফসফরাস	০.১৬	১.৫-২.০	১.৪০	-	২০	১-২
পটাশিয়াম	০.৫-১.৯	০.৮৫	০.৮	-	-	৩-৪

জৈব ও অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা ঃ

জৈব সারের সুবিধা ঃ

- সরাসরি প্লাংকটনও ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়
- বেলে ও দোঁ-আশ মাটির পুকুরে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
- স্থানীয়ভাবে কম খরচে/বিনা খরচে পাওয়া যায়
- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম বা নাই
- প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য কমবেশি সব ধরনের পুষ্টি বিদ্যমান
- সারের আঁশ ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

জৈব সারের অসুবিধা ঃ

- পরজীবী ও রোগের বাহকের জন্য দায়ী থাকে
- যৌগ পদার্থ হওয়ার কারণে দেরীতে ফলাফল পাওয়া যায়
- তলায় জমা হয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে
- অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োগ পদ্ধতি কিছুটা জটিল
- ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

অজৈব সারের সুবিধা ঃ

- দ্রুত কার্যকর
- বাজারে সহজ প্রাপ্য
- নির্দিষ্ট মাত্রার পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ
- প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ ।

অজৈব সারের অসুবিধাঃ

- কার্যকারীতা ক্ষণস্থায়ী
- মাটির গঠন শক্ত হয়ে যায়
- মাটির অনুজীবের কার্যকারীতা কমে যায়
- বহুদিন ধরে ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে পুকুরের উৎপাদনশীলতা কমে যায়

সার প্রয়োগের মাত্রা ঃ

পুকুরে সার প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মজুদকৃত মাছের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদন । পর্যাপ্ত প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য একটি পুকুরে কি পরিমাণ সার প্রযোগ করতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে । যেমন-

১. মাটির অবস্থা
২. পানির মধ্যকার শেওলার পুষ্টি চাহিদা
৩. পরিবেশের অবস্থা (তাপমাত্রা, মেঘ-বৃষ্টি)
৪. সারের গুণাগুণ
৫. সারের প্রাপ্যতা ।

এছাড়াও পুকুরের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে চাষীর অভিজ্ঞাতও সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । সাধারণভাবে একটি নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীণ সারের সুপারিশকৃত মাত্রা নিম্নরূপ-

সারণী- ০৯ ঃ সুপারিশকৃত সারের মাত্রা

সার	প্রয়োগমাত্রা/শতাংশ
গোবর অথবা কম্পোষ্ট অথবা হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	৫-৭ কেজি ৮-১০কেজি ৩-৫ কেজি
অজৈব সার (ইউরিয়া)	১০০-১৫০ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম

চিত্র-১০ঃ বিভিন্ন ধরণের সার ও স্থানীয় পরিমাপক

চিত্র-৬ ঃ বিভিন্ন ধরনের সার ও স্থানীয় পরিমাপক

টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ইউরিয়ার প্রয়োগ মাত্রা অর্ধেক হবে ।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

শুকনা পুকুরঃ প্রয়োজনীয় জৈব সার সমান ভাবে তলায় ছড়িয়ে দেয়ার পর চাষ দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । তবে শুকানোর পর তলায় একটি গর্ত খুড়লে যদি দেখা যায় মাটি হতে অতিরিক্ত লাল কষ বের হয় তবে চাষ না দেয়াই ভাল । প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত মাত্রার জৈব সারের সাথে কিছু সরিষার

খৈল (০.৫ কেজি/শতাংশ) মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভরাটের পর টিএসপি সার ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছিটানোর পূর্বে ইউরিয়ার সাথে একত্রে পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পানি ভর্তি পুকুর ঃ টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে উহাদের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে সমানভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন খুব বড় হলে জৈব সার পানিতে গুলে প্রয়োগ করা বেশ অসুবিধাজনক। সে ক্ষেত্রে জৈব সার শুকনা অবস্থায় সতর্কতার সাথে সমানভাবে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

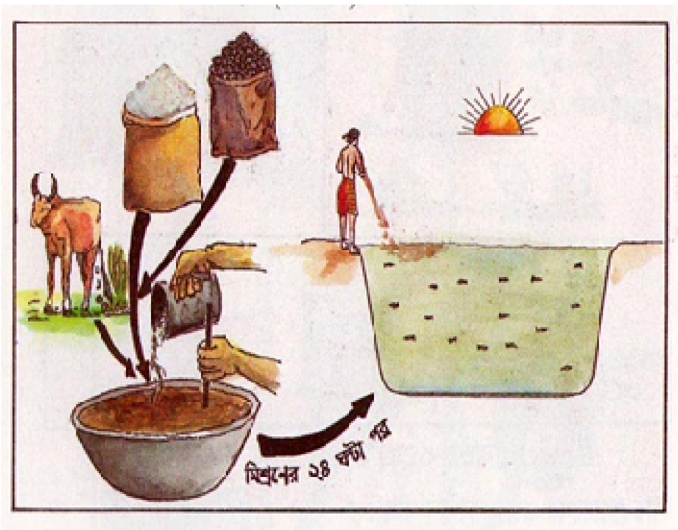

চিত্র-৭ ঃ সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সার প্রয়োগের সময় ঃ

চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর এবং রেণু মজুদের ৮-১০ দিন আগে নার্সারি পুকুরে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ করতে হবে। দিনের যে কোন সময় সার প্রয়োগ করা যায়। তবে, সাধারণতঃ সূর্যোলোক পড়ার পর সার প্রয়োগ করাই উত্তম। এ সময়টি সকাল থেকে দুপুরের মধ্যেই নির্ধারণ করা উচিত।

সার প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

- মিশ্র সার ব্যবহারের পূর্বে পরিমিত পানিতে খুব ভালভবে গুলে নিলে কার্যকারিতা কমে যায়
- মেঘলা দিন বা বৃষ্টির মধ্যে সার প্রয়োগ করলে কার্যকারিতা কম হয়ে থাকে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।
- পানিতে জলজ উদ্ভিদ থাকলে সারের কার্যকারীতা কম হয়। কারণ পুষ্টিকর পদার্থ উদ্ভিদ প্লাংকটনের চেয়ে আগাছাই বেশি গ্রহণ করে থাকে।

৩.৩ প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ঃ

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

- পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে কি না তা জানা
- পুকুরের পরিবেশ রেণু ছড়ার উপযোগী কিনা তা জানা
- পুকুরে আরও সার প্রয়োগ করতে হবে কিনা তা জানা।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ

নার্সারি পুকুরে রেণুর প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা তা প্রথমেই খালি চোখে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে পানির রং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

১. সেকিডিস্ক পদ্ধতি ঃ

সেকিডিস্ক একটি লোহার চাকতি বিশেষ। এর ব্যাস ২০ সে.মি., রং সাদা ও কালো। এটি তিন রংয়ের একটি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। গোড়া থেকে প্রথম ২০সে.মি. লাল, দ্বিতীয় ১০ সে.মি. সবুজ এবং বাকী অংশ সাদা (১০০-১২০ সে.মি.)

ব্যবহার কৌশল ঃ
পানিতে লাল সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর সেকিডিস্কের সাদা কালো অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পুকুরে অতিরিক্ত খাদ্য আছে। তবে পানি ঘোলা থাকলেও এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় পুকুরে রেণু ছাড়া যাবে না। পানিতে সবুজ সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর তলার সাদা অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পানিতে পরিমিত খাদ্য আছে।

ব্যবহারের সময় ঃ
এটি ব্যবহার করতে হবে প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সকাল ১০-১১ টায়। সূর্যের অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি ব্যবহার করা উচিত।

সতর্কতা ঃ

- একই ব্যক্তি একই স্থানে একই সময় খাদ্য পরিমাপ করবে
- ঘোলা পানিতে বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে সেকিডিস্ক ব্যবহার করা যাবে না
- সেকিডিস্ক রিডিং সঠিকভাবে নিতে হবে

সেকিডিস্কের লাল ও সবুজ সুতার দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

চিত্র-৮ ঃ সেকিডিস্ক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

গামছা গ্ল াস পদ্ধতি ঃ

পুকুর প্রস্তুতকালীণ সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর গামছার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে নিতে হবে। সূর্যের আলোতে যদি গ্লাসের মধ্যে সবুজ কণা, ক্ষুদ্র প্রাণীকণা (গ্লাসে প্রতি ৫-১০) দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

সতর্কতা ঃ

- অস্বচ্ছ, রঙ্গিন বা ছাপমারা গ্লাস ব্যবহার করা যাবে না।
- ঘোলা পানিতে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না।

হাত পদ্ধতি ঃ

নিজের হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবানোর পর, হাতের তালু/পাতা দেখতে হবে। পানির রং সবুজাভ থাকলে এবং হাতের তালু দেখা না গেলে বুঝতে হবে পরিমিত খাদ্য আছে। সূর্যালোকিত দিনে সকাল ১০-১১ টায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।

সতর্কতা ঃ

- ঘোলা পানিতে ফলাফল আসবে না
- ছোট হাত ব্যবহার করা যাবে না
- হাতের তালু ফর্সা হতে হবে
- একই ব্যক্তিকে একই স্থানে প্রতিবার পরীক্ষা করতে হবে।

৩.৪ জলজ পোকামাকড় দমন ঃ

পুকুরে সার প্রয়োগের পর পানিতে প্রাকৃতিক খাবার বৃদ্ধির সাথে সাথে রেণু পোনার ক্ষতি করে এমন অনেক ধরনের জলজ পোকা মাকড় সৃষ্টি হয়। যেমনঃ হাঁস পোকা, ড্রাগনফ্লাই, ওয়াটার ষ্টোক, আংগুলি পোকা, গোবরা পোকা, বড় আকৃতির জু-প্লাংকটন যেমন- ক্লাডোসিরা, কপিপোড ইত্যাদি। নার্সারি পুকুরে এ সমস্ত পোকা-মাকড় থাকলে এরা

- রেণু খাদ্য উপযোগী কীট (জু-প্লাংকটন) নষ্ট করে
- রেণু পোনা ধরে খায় বা পেট কেটে মেরে ফেলে।

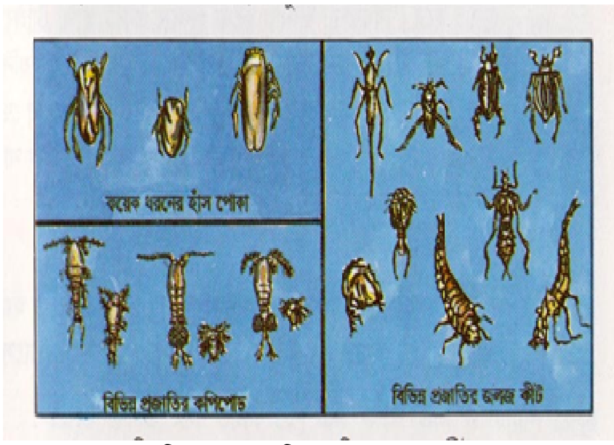

চিত্র-৮ ঃ ক্ষতিকর পোকা-মাকড়

জলজ পোকা-মাকড় দমন পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক বা ডিজেল/কেরোসিন প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুরের জলজ পোকা-মাকড় ভালভাবে দমন করা যায়। নিচে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-
ডিপট্যারেক্স ঃ ৬-১২ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা
সুমিথিয়নঃ ২-৩ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা
নোভান/নগস ঃ ২-৩ গ্রাম/শতাংশে/ফুট পানির গভীরতা ।

কীটনাশক ব্যবহার বিধি ঃ

প্রয়োজনীয় কীটনাশক একটি পাত্রের মধ্যে ১০লি. পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপট্যারেক্স প্রয়োগের পর জলজ পোকা-মাকড় মারা যাওয়া শুরু করলে সমস্ত পোকা-মাকড় চটজাল দ্বারা তুলে ফেলতে হবে। দুপুর রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা, মেঘ কিংবা বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করাই উচিত।

কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতাঃ

- কীটনাশক ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীকে নাক, মুখ, শরীর কাপড়ে ঢেকে চশমা পরে নিতে হবে।
- বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করতে হবে।
- ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালভাবে গোসল করতে হবে।

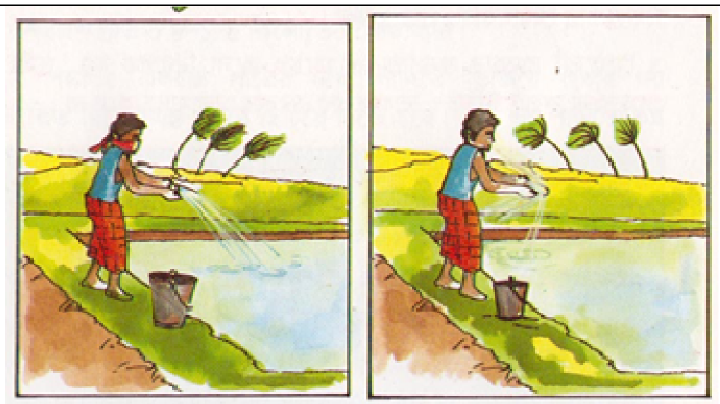
চিত্র-৮ ঃ কীটনাশকের ব্যবহার

ডিজেল বা কেরোসিন ঃ

প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি বা প্রতি ৮ শতাংশ জলাশয়ে ১ লি. প্রয়োগ করতে হবে। (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট)

- পুকুরের পানি যখন ঢেউ হীন অবস্থায় থাকবে
- বাতাস থাকায় যদি পুকুরের পানিতে ঢেউ থাকে তাহলে চটজাল টেনে জালের মধ্যে দিতে হবে। এ প্রক্রিয়া ২/৩ বার করে ভাল হয়।
- সমস্ত মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হবে।

জাল টেনে ঃ

ঘন নাইলনের জাল (ঘন পলিষ্টার নেট) বার বার টেনে ক্ষতিকারক পোকামাকড় সহনশীল মাত্রায় কমিয়ে আনা যায় ।

জলজ পোকা-মাকড় দমনের সময় ঃ

উপরের উল্লেখিত যে কোন একটি পদ্ধতি পোনা ছাড়ার ১-২ দিন আগে করতে হবে ।

৪. মাছের পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

মজুদ ব্যবস্থাপনার ধাপ সমূহ একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম । এ পর্যায়ের প্রতিটি ধাপই লাভজনকভাবে চাষের জন্য অত্যন্ত যত্নের সাথে করা প্রয়োজন । যে কোন একটি ধাপের অনিয়মিত বা অপরিমিত প্রয়োগ সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে ।

মজুদ ব্যবস্থাপনার পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

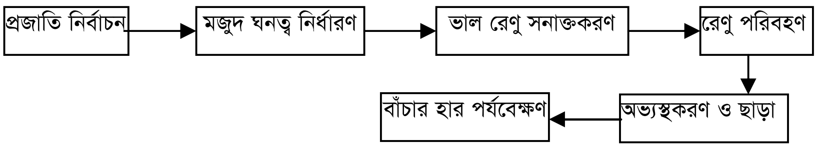

৪.১.প্রজাতি নির্বাচন ঃ

নার্সারি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক মুনাফা অর্জন । সে কারণে নার্সারিতে/পুকুরে কোন্ প্রজাতি চাষ করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয় । যেমন-

- নির্বাচিত প্রজাতির এলাকাগত প্রাপ্যতা
- পুকুরের ধরণ
- চাষের ধরণ
- চাষীর অভিজ্ঞতা
- চাষীর আর্থিক সংগতি

উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আমাদের দেশে সাধারণত রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, বিগহেড, সরপুঁটি, কমন কার্প ও পাংগাসের পোনা চাষ করা হয়ে থাকে ।

ভাল রেণু সনাক্তকরণ ঃ

বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে মাছের রেণু সনাক্ত করা যায় । কিন্তু সকল প্রজাতির রেণুর ক্ষেত্রেই সাধারন কিছু বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে এদের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । রেণু ক্রয়ের সময় অবশ্যই যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে উহাদের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন । মাছের রেণুর গুণগত মান নির্ধারণের কিছু পর্যবেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল ।

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল রেণু	খারাপ রেণু
চলাফেরা	সন্তরণশীল (সাতার কাটা অবস্থা)	স্থির
দেহের রং	কালচে-বাদামী	ফ্যাকাসে, সাদাটে
আচরণ	পাত্রে হাত দিলে দ্রুত সরে যায়	পাত্রে হাত দিলে ধীরে ধীরে সরে যায়
হঠাৎ পাত্রের গায়ে টোকা দিলে	লাফিয়ে উঠে	কোন সাড়া দেয় না ।

যথাযথ মানসম্পন্ন রেণু মজুদ করা না হলে ঃ

- মৃত্যুহার বেশি হওয়ার কারণে চারা পোনার উৎপাদন কমে যায়
- একাধিক উৎপাদন চক্র সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না
- সময়মত বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় ভাল বাজার দর পাওয়া যাবে না ।

৪.২ পোনা পরিবহণ ঃ

পোনা পরিবহণের গুরু ত্ব ঃ

মাছের পোনা চাষের জন্য হ্যাচারি বা নার্সারি অথবা প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহ করা হয় । পোনা মাছকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করাকে পোনা পরিবহণ বলে । পোনা পরিবহণের উদ্দেশ্য হলো সুস্থ-সবল পোনা চাষীর পুকুরে পৌঁছে দেয়া ।

সঠিকভাবে পোনা পরিবহণ না করলে পোনা মজুদের সময় অথবা পোনা মজুদ করার পর প্রথম সপ্তাহেই অনেক পোনা মারা যায় । তাছাড়া মজুদের পর দুর্বল পোনা সহজেই রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে । পরিবহণের সময় বা পোনা মজুদের পর মাছ মারা গেলে মাছের পোনা চাষে লাভ কমে যায় ।

পোনা পরিবহণের দক্ষতা বা সফলতা পোনা চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সঠিকভাবে পোনা পরিবহণের উদ্দেশ্য হলো যত্নসহকারে পোনা পরিবহণের মাধ্যমে পোনার মৃত্যুর হার কমানো ।

কী কী পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ করা হয়ে থকে-

আমাদের দেশে দুই পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ করা হয়ে থাকে । একটি সনাতন পদ্ধতি ও অন্যটি আধুনিক পদ্ধতি ।

সনাতন পদ্ধতি ঃ সনাতন পদ্ধতিতে হ্যাচারি বা নার্সারি থেকে মাছের পোনা চাষীর পুকুরে পাতিলে (মাটির বা এ্যালুমিনিয়াম), নৌকায় পোনা পরিবহণ করে থাকে ।

নৌকায় পোনা পরিবহণঃ মাছ চাষের শুরু থেকেই আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্যজীবীগণ ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে পোনা পবিহণ করতেন । নৌকার তলায় কাদা দিয়ে বা কাদা ছাড়া পরিমাণমত পানি রেখে তাতে নদী থেকে পোনা ধরে নৌকার পানিতে রেখে দিতেন । নৌকার আয়তনের ওপর পোনার ঘনত্ব নির্ভর করে । দুরবর্তীস্থানে পোনা পরিবহণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে নৌকার পানি পরিবর্তন করা হয় । বর্তমানে নৌকায় পোনা পরিবহণের খুব বেশি প্রচলন নেই । নৌকায় পোনা পরিবহণে পোনা মৃত্যুর হার অনেক কম ।

পাতিলে পোনা পরিবহণ ঃ

- পাতিলে পোনা পরিবহণের ক্ষেত্রে মাটির বা এল্যুমিনিয়ামের পাতিল ব্যবহার করা হয়ে থাকে । তবে মাটির পাতিল তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা থাকে বলে পোনা বেশি সতেজ/ভাল থকে ।
- ২০ থেকে ৩০ লিটার পানি ধরে এমন পাতিলে প্রায় সম্পূর্ণ পানি ভর্তি করে ৩ থেকে ৫ সে.মি. আকারের ৫০০ হতে ১২০০টি টেকসই করা পোনা পরিবহণ করা যাবে ।
- পোনা ভর্তি পাতিলের মুখ জাল বা পাতলা ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে পোনা লাফিয়ে বের হতে না পারে ।
- পোনা পরিবহণের সময় পাত্রের পানিতে বাতাস হতে অক্সিজেন মিশানোর জন্য পাতিল মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিতে হবে বা পাতিলের ভিতরে পানি ছিটাতে হবে ।
- পরিবহণকালে মাছের মল-মূত্র পঁচে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করে, যা মাছের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । সেজন্য দূরে পোনা পরিবহণের সময় দেড় ঘন্টা পর পর পাতিলের পানির তিন ভাগের দুই ভাগ ভাল পানি দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে ।
- পাতিলের মুখে ঢাকনা হিসেবে ছোট জাল বেঁধে জালের মাথায় একটি দড়ি লাগিয়ে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে দড়ি উপরে-নিচে টেনে বাতাস থেকে পাতিলে অনবরত অক্সিজেন সরবরাহ করা যায় ।
- সাধারণত পরিবহণকারী নিজের মাথায় একটি পাতিল বহণ করতে পারে । একটি বাঁশ বা কাঠের দুই পার্শ্বে দুইটি পাতিল বেধে কাঁধের দুইপার্শ্বে পাতিল দুইটি ঝুলিয়ে পরিবহণ করতে পারেন । তা'ছাড়া যে কোন যানবাহনে যেমন- রিক্সা, ভ্যান রিক্সা ইত্যাদির মাধ্যমে পোনার পাতিল পরিবহণ করা যায় ।

আধুনিক পদ্ধতি ঃ

বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহণ করা হয় ।

পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণের সুবিধাঃ

- পাতিলে পরিবহণকালে পাত্রের গায়ে ধাক্কা বা খোঁচা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণকালে পোনার শারীরিক ক্ষতির আশংকা থাকে না ।

- সনাতন পদ্ধতিতে পাত্রের পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। তাই সনাতন পদ্ধতি পোনা পরিবহনের ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। অপরদিকে অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে সাধারণতঃ অক্সিজেনের অভাব ঘটে না।
- সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ অধিক শ্রম নির্ভর কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খুবই কম পরিশ্রমে পোনা পরিবহণ করা যায়।
- সনাতন পদ্ধতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, অপরদিকে আধুনিক পদ্ধতি খুবই নিরাপদ ও সুবিধাজনক।
- আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক দূরবর্তী স্থানে সহজেই পোনা পরিবহণ করা সম্ভব।

পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণ পদ্ধতি ঃ

- পোনা মাছ পরিবহণের জন্য সাধারণতঃ ৮০ থেকে ৯০ সে.মি. লম্বা এবং ৫০ থেকে ৬০ সে.মি. চওড়া পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।
- পলিথিন ব্যাগের চার ভাগের এক ভাগ ভাল পানি দিয়ে ভর্তি করে ঝাঁকি দিয়ে দেখতে হবে পলিথিন ব্যাগে কোন ছিদ্র আছে কিনা। পলিথিন ব্যাগে ছিদ্র থাকলে অক্সিজেন বের হয়ে পোনা মারা যাবে। সে কারণে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য একটি পলিথিন ব্যাগ আরেকটি পলিথিন ব্যাগের ভিতর নিয়ে পোনা পরিবহণ করতে হবে।
- অক্সিজেনসহ ব্যাগের পানিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা মাছ দিতে হবে। পোনা মাছের ঘনত্ব নির্ভর করবে পোনার প্রজাতি, পোনার আকৃতি, পরিবহণের দূরত্ব ও আবহাওয়ার ওপর।
- পলিথিন ব্যাগে পোনা দেওয়ার পর ব্যাগটিকে হালকা চাপ দিয়ে সংকুচিত করে তাতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপটি পানির ভিতর ঢুকিয়ে পলিথিন ব্যাগের অবশিষ্ট চার ভাগের দুই ভাগ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।
- অক্সিজেন পূর্ণ করার পর ব্যাগটি চিকন সুতলি দিয়ে ভালভবে বেঁধে দিতে হবে।
- দূরবর্তী স্থানে পোনা পরিবহণ করতে হলে পলিথিন ব্যাগ চটের ভিজা ব্যাগে বা শক্ত কাগজের বাক্সে বা কার্টুনে ঢুকাতে হবে।

নিচের ছকে পলিথিন ব্যাগে পোনার ঘনত্ব দেখানো হলো ঃ

প্রজাতি	পোনার আকার/প্রকৃতি	পরিবহণ কাল/সময় (ঘন্টা)	পোনার সংখ্যা/লিটার পানি
রুইজাতীয় (কার্প)	১ থেকে ১.৫ সে.মি.	সর্বোচ্চ ১০	৮০০ থেকে ১,০০০টি
অন্যান্য মাছের রেণু	৪ থেকে ৫ সে.মি.	সর্বোচ্চ ১০	২০০ থেকে ৩০০টি

পরিবহণকালীণ সতর্কতা ঃ

- পোনা নাড়াচড়ার সময় পোনার দেহের পিচ্ছিলতা যেন চলে না যায়।
- সরাসরি পোনা হাত দিয়ে না ধরে জাল অথবা নরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
- পরিবহণ পাত্র ভিজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- পরিবহণকালে পাত্রের তাপমাত্রা কম রাখতে হবে। সেজন্য পরিবহণকালে পোনার পাত্র/ব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- পাত্রের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত পোনা পরিবহণ করা যাবে না।
- বিভিন্ন আকারের ও প্রজাতির পোনা একত্রে পরিবহণ করা ভাল না।
- পলিথিন ব্যাগে যাতে টিনের কোনা, পেরেক বা অন্য কোন শক্ত বস্তুর আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পাতিল বা ড্রামে পরিবহণকালে পাত্রের পানি নাড়াচাড়া করতে হবে।
- মৃত পোনা সাথে সাথে পাতিল বা ড্রাম হতে অপসারণ করতে হবে।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ঃ

পানির বিষাক্ততা হচ্ছে পানির এমন এক বিশেষ অবস্থা যা পুকুরে মজুদ করা রেণু বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি করে। পানিতে বিদ্যমান বিষাক্ত পদার্থ রক্ত কণিকার সাথে বিক্রিয়া করে, ফুলকার উপর জমা হয়ে শ্বাস প্রশ্বাসে বাঁধা সৃষ্টি করে। এর ফলে পোনা মারা যেতে পারে। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার কাজটি পোনা ক্রয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার পূর্বেই করতে হবে।

পানিতে বিষাক্ততার উৎস ঃ

পুকুরের পানিতে বিষাক্ততার একাধিক উৎস থাকতে পারে, যেমন-

- পুকুরের ঔষধ প্রয়োগ
- জলজ পোকা-মাকড় দমনে প্রয়োগকৃত কীটনাশক
- তলায় পুঞ্জিভূত অতিরিক্ত জৈব পদার্থের পঁচন ।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করার জন্য সাধারণতঃ যে সব ঔষধ ও বিষ ব্যবহার করা হয় তাদের বিষাক্ততার মেয়াদকাল ৭-৩০ দিন পর্যন্ত হতে পারে । বিষাক্ততার মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি পুকুরে রেণু মজুদ করা হয় তবে এরা ব্যাপক হারে মারা যাবে । তাই রেণুর বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য মজুদ করার পূর্বেই পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন ।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার সময় ঃ

মজুদ করার ১-২ দিন পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করে নেয়া উচিত ।

৪.৩. পানির বিষাক্ততা পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ

যে পুকুরে রেণু মজুদ করা হবে তার পানি একটি বালতি বা ডেকচির মধ্যে নিয়ে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যায় । এজন্য দুটো ডেকচি একটিতে রেণু ছাড়ার পুকুরের পানি এবং অন্যটিতে টিউবলের পানি নিতে হবে । ডেকচি দুটিতে অল্প কিছু রেণু ছেড়ে তিন-চার ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে । যদি সবগুলো পোনা বেঁচে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পানির বিষাক্ততা নেই ।

পোনা ছাড়ার জন্য পুকুরের উপযুক্ততা যাচাই ঃ

পুকুরের পোনা ছাড়ার আগে করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ-

১. পুকুরের পাড় ও তলা ঠিক করা ।
২. পুকুর পাড়ের ঝোপ পরিষ্কার সহ বড় বড় গাছের ডাল কেটে ফেলা
৩. পুকুরের জলজ আগাছা তুলে ফেলা
৪. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সরানো
৫. পুকুরে চুন প্রয়োগ
৬. পুকুরে সার প্রয়োগ ।

উপরের কাজগুলো যথাযথভাবে করার পর পুকুরে সার দেয়ার ৪/৫ দিনের মধ্যে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হবে এবং তা নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে ।

১. খালি চোখে দেখে
২. সেকিডিস্ক পদ্ধতি
৩. হাত পদ্ধতি
৪. গামছা পদ্ধতি

কেবলমাত্র পুকুর ভালো করে তৈরি করার পর যখন পানির রং সবুজ বা হালকা বাদামি হবে তখনই পোনা ছাড়তে হবে ।

পোনা শোধন ও পোনা ছাড়া

পোনা শোধন

পোনা পরিবহণকালে পোনা আঘাতপ্রাপ্ত ও দুবর্লতার জন্য সহজেই পুকুরে রোগাক্রান্ত হতে পারে । এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনা শোধন করে নেয়া ভাল ।

পোনা শোধনের কারণ

- পোনাগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ।
- পোনাগুলোর পরিবহণকালীন আঘাত জনিত অবস্থার উন্নতির জন্য ।

পোনা শোধনের পদ্ধতি

- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট গুলে নিয়ে তাতে পোনা মাছগুলোকে এক/দুই মিনিট ডুবিয়ে গোসল করানোর মাধ্যমে। অথবা-
- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম (১ পোয়া) খাবার লবণ গুলে নিয়ে তাতে পোনা মাছগুলোকে এক/দুই মিনিট ডুবিয়ে গোসল করানোর মাধ্যমে।

৪.৪. পোনা অভ্যস্ত করণ ঃ

পোনা অভ্যস্ত করণের কারণঃ

- পোনা পরিবহণকৃত পাত্র/পলিথিন ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর সাথে পুকুরের পানির সমতা আনার জন্য।

পোনা অভ্যস্ত করণের সময় ঃ পুকুরে পোনা ছাড়ার সময়।

কিভাবে পোনা অভ্যস্ত করতে হবে ঃ

পোনা পরিবহণকৃত পাত্র (পাতিল/পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি) হতে কিছু পানি ফেলে দিয়ে সমপরিমাণ পুকুরের পানি পাত্রে ঢুকিয়ে নিয়ে পাত্রটি নাড়া-চাড়া করে আবার কিছু পানি ফেলে দিয়ে পুনঃসমপরিমাণ পানি পাত্রে ঢুকানোর মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিবার পাত্রের মোট পানির আট ভাগের একভাগ ফেলে দিয়ে এবং সমপরিমাণ পুকুরের পানি ঢুকানো হলে আট বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে পোনাকে পুকুরের নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্তকরণ বা খাপ খাওয়ানো যায়। পরিবহণ পাত্রে এক হাত ডুবিয়ে অন্য হাত পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে তাপমাত্রার সমতা পরীক্ষা করা যায়। এরপর পরিবহণ পাত্র একটু কাত করে ধরলে পোনাগুলো আপনা আপনি পাত্র হতে পুকুরে চলে যাবে।

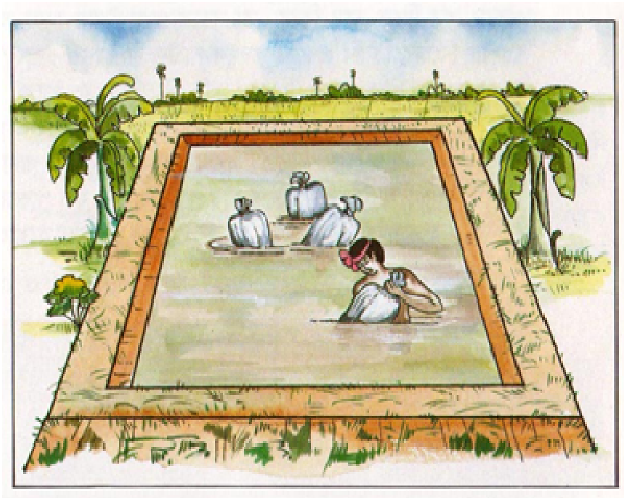

চিত্র-৯ : পোনা ছাড়ার কৌশল

৪.৫. পোনা ছাড়া ঃ

পুকুরের কোন স্থানে পোনা ছাড়বেন

- পাড়ের কাছাকাছি ছায়াযুক্ত স্থানে

দিনের কোন সময় পোনা ছাড়বেন ঃ
সকাল অথবা পর্যন্ত বিকালে যখন পানির তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে।

পোনা মজুদপরবর্তী সতর্কতা ঃ

- রেণু ছাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে পুকুরে চট/মশারী জাল টানা ঠিক নয়
- রেণু ভেসে উঠলে পানির ঝাপটা দিতে হবে নতুন পানি যোগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়
- পুকুরের পানির রং লালচে সবুজ এবং সেকিডিস্কেও দৃশ্যমানতা ২০-৩০ সে.মি. এর মধ্যে থাকা উচিত।
- পোনার খাদ্য অত্যন্ত মিহি হওয়া উচিত।
- সূর্য ওঠার ৫-৬ ঘন্টা পর হররা টানা উচিত। অক্সিজেনে ঘাটতি থাকা অবস্থায় এবং রেণু ছাড়ার পর প্রথম ২-৩ দিন হররা টানা উচিত নয়
- মেঘলা দিনে সার ও খাদ্য দেয়া যাবে না
- কুঁড়া ব্যাবাহার করলে তুষ পরিহার করে মিহি কুঁড়া ব্যবহার করতে হবে।

৫. পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদকালীন ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

৫.১ সম্পূরক খাদ্য পরিচিতি ঃ

অন্যান্য জীবের মতো মাছের ও খাদ্যের প্রয়োজন। মাছের বৃদ্ধি, জীবন ধারন, প্রজনন এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অপরিহার্য। মাছ জলজ প্রাণী। এ কারণে স্বভাবতই পানি থেকেই মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। মাছ তার পর্যাপ্ত খাবার পেলে সুষ্ঠ ভাবে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশে খাল বিল নদীনালায় মাছকে কেউ খাবার সরবরাহ না করলেও প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মাছ খাদ্য হিসেবে ফাইটো- প্লাংক্টন, জলজ কীট, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি খেয়ে থাকে তবে পুকুরে পরিকল্পিত মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি মাছকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সম্পূরক খাবার উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ উভয় প্রকার হতে পারে। তবে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, আটা, ময়দা, তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিনের খৈল, শুটকি মাছের গুড়া, মিট এন্ড বোন মিল, কুটি পোনা এমনকি হাঁস-মুরগি বা গরু-ছাগলের নাড়ি ভুড়ি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পুকুরে ব্যবহার্য মাছের খাদ্যের মধ্যে আরো রয়েছে তরকারির খোসা, নরম সবুজ উদ্ভিদ, ক্ষুদিপানা, সুজিপানা, আলুপাতা, পেপেপাতা, কলাপাতা, ইপিলপাতা, শামুকের মাংস, পোকা মাকড়ের ডিম, কেঁচো, পশুর রক্ত প্রভৃতি। সম্পূরক খাবার হাতে তৈরী করে প্রয়োগ করা যায় আবার মেশিনে তৈরী করেও প্রয়োগ করা যায়।

সম্পূরক খাবার ঃ

প্রাকৃতিক উৎস থেকে জলজ প্রাণী যদি যথেষ্ট খাবার না পায় তখন তাকে বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, কেননা মাছের প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব হলে বৃদ্ধি এবং প্রজনন সব ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্থ হবে। প্রাকৃতিক খাবারের বিকল্প যে খাবার বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয় তাকে সম্পূরক খাবার বলা হয়ে থাকে।

সম্পূরক খাবারের গুরু ত্ব ঃ

সুষম ভাবে প্রস্তুতকৃত সম্পূরক খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় সে গুলো হচ্ছে

- অধিক ঘনত্বে পোনার চাষ করা যায়
- কম সময়ে বড় আকারের সুস্থ ও সবল পোনা তৈরী করা যায়
- কৃত্রিম খাদ্যে পুষ্টি বিরোধী উপাদান বাদ দেয়া যায়
- খাদ্য রূপান্তর হার আকর্ষনীয় হয়
- পোনা বাচাঁর হার বেড়ে যায়
- পুষ্টির অভাব জনিত রোগ থেকে মুক্তি পায়
- মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- খাবারের সাথে প্রয়োজনীয় ঔষধ মেশানো যায়
- কম সময়ে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়

সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ঃ

সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করা হয়। বিবেচ্য বিষয় গুলো হচ্ছে

- পোনার খাদ্যাভ্যাস
- পোনার বয়স, আকার ও আকৃতি
- পোনার দৈহিক ওজন
- প্রাকৃতিক খাবারের পরিমাণ
- পোনা মাছের ঘনত্ব
- খাবারের গুগত মান
- পোনা মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার ধরন
- খাদ্য রূপান্তর হার
- পানির রং এবং তাপমাত্রা

সম্পূরক খাবারের বৈশিষ্টাবলী

পুকুরে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তা সম্পূরক খাবার। সম্পূরক খাবারের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেমনঃ-

- খাদ্য উপাদান পুষ্টিমান সম্পন্ন হতে হবে
- খাবার পচাঁ বাশি বা দূর্গন্ধযুক্ত হবে না
- খাবার অবশ্যই সুষম মানের হতে হবে
- খাবারের বিভিন্ন উপাদানে সমন্বয়ে হলে অবশ্যই মিশ্রন সমসত্ত্ব হবে
- খাবারের স্বাদও গন্ধ সহজেই মাছকে প্রলুদ্ধ করবে
- পানির সাথে খুব কম সময়ে খাবার মিশে যাবেনা
- খাবার অবশ্যই ছত্রাক মুক্ত এবং বিষ মুক্ত হবে
- মানসম্পন্ন খাবার প্রয়োগে সব মাছ প্রায় (একই প্রজাতির হলে) সমান ওজনের হবে
- খাবার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে
- খাবার প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে মাছ সব খাবার খেয়ে নেবে
- খাবার অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ
রেণু বা পোনা অবস্থায় নার্সারি ফিড একটি নির্দিষ্ট পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে হাত দিয়ে বা ছোট প্লেট/বাটি দিয়ে পুকুরের দুই বা তিনটি স্থানে ছিটিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে মাছের বয়স অনুসারে খাদ্যের গ্রেড ও পরিমাণ পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং প্রয়োগ পদ্ধতি একই থাকবে।

উপকরণ ঃ সহজ প্রাপ্য এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সম্পূরক খাদ্য হিসেবে গমের ভূষি, চালের কুড়া, সরিষার খৈল ব্যবহার করা যায়। এ সমস্ত খাদ্যে প্রোটিন মান কম, তবে তা প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক।

খাদ্যের পরিমাণ ঃ খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরের প্রাকৃতকি খাদ্যের অবস্থা, রেণুর মোট ওজন এবং তাপমাত্রার উপর। পুকুরে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে তবে রেণু মজুদের প্রথম ৩-৫ দিন কোন প্রকার সম্পূরক খাদ্য না দিলেও চলে। তারপর তাদের দেহের ওজন অনুপাতে পুকুরে খাদ্য দিতে হয়।

মজুদের পর খাদ্যের পরিমাণ

১-৫ দিন	মজুদকৃত পোনার ওজনের ২ গুণ/দিন
৬-১০ দিন	মজুদকৃত পোনার ওজনের ৩ গুণ/দিন
১১-১৫ দিন	মজুদকৃত পোনার ওজনের ৪ গুণ/দিন
১৬-২০ দিন	মজুদকৃত পোনার ওজনের ৫ গুণ/দিন

খাদ্যে প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ রেণু মজুদের প্রথম ৫ দিন পর্যন্ত সাধারণত ঃ খৈল প্রয়োগ করা সবচেয়ে ভাল। তারপর তার সাথে কুঁড়া/ভূষির মিশ্রণ দেয়া যায় (৫০ঃ৫০)। উল্লেখিত খাদ্য একত্রে একটি পাত্রে অল্প পানির মধ্যে ভালভাবে মিশানোর পর সমস্ত পুকুরে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। খাদ্যের এ মাত্রা ধানী কাটাই না করা পর্যন্ত চলবে।

খাদ্য প্রয়োগের সময়ঃ খাদ্য দিতে হয় হয় সকাল ১০-১১ টায় একবার এবং বিকেল ৩-৪ টায় আরেকবার (৫০-৫০)
বিভিন্ন মৎস্য খামারে সম্পূরক খাদ্যের উপর এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে খৈল (৩৫-৪০%), ভূষি (২০-২৫%) এবং গবাদি পশুর রক্তের (৩৫-৪০%) মিশ্রণ পোনা চাষে অত্যন্ত কার্যকর। এ মিশ্রণ প্রয়োগে রেণু থেকে ধানী পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার প্রায় ৯০% পাওয়া গেছে (এফ.এ. ও ১৯৯২)। গড়ে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ছিল পোনার দেহ ওজনের প্রায় ৩ গুণ ।

খাদ্য প্রয়োগের পরীক্ষাকৃত মাত্রা

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (শতাংশ/দিন)
সরিষার খৈল	৪০-৫০ গ্রাম
গমের ভূষি	২০-৩০ গ্রাম
গবাদি পশুর রক্ত	৪০-৫০ গ্রাম (যদি সম্ভব হয়)
মোট	১০০-১৩০ গ্রাম

সবুজ খাদ্য প্রয়োগ ঃ

পুকুরে গ্রাসকার্প ও সরপুঁটির রেণু মজুদ করা হলে এবং বড় হয়ে এরা ক্ষুদিপনা খাওয়া শুরু করলে নিয়মিত তা প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষুদিপানার পরিমাণ মজুদকৃত পোনার মোট ওজনের ৪০-৫০% পর্যন্ত হতে পারে। পুকুরে প্রয়োগের আগে ক্ষুদিপানা পানিতে ধুয়ে নেয়া উচিত। তা না হলে পোনা ক্ষত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গ্রাস কার্প ও পুঁটির জন্য ক্ষুদিপানা, বাঁশ বা অন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমের মধ্যে দিতে হবে। ফ্রেমটি পাড়ের ৩-৬ ফুট দূরত্বে স্থাপন করতে হয়।

খাদ্য প্রয়োগে সর্তকতা

- প্রতি সপ্তাহে পোনার দৈহিক বৃদ্ধির সাথে হিসাব করে খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- পুকুরের পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

৫.২ মজুদ কালীন অন্যান্য যত্ন ও সেবা কার্যক্রম সমূহ ঃ

১. বেড়া/ঘন ফাঁসের নীল জাল দিয়ে ঘিরে দেয়া (প্রয়োজন হলে)
২. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা
৩. নিয়মিত খাদ্য দেয়া
৪. নিয়মিত সার দেয়া
৫. নিয়মিত চুন দেওয়া
৬. নিয়মিত নমুনায়ন করা।

৬. পোনা চাষের জন্য পুকুরের মজুদ পরবর্তী অত্যাবশ্যকীয় করণীয় সমূহ ঃ

৬.১ মজুদ-পরবর্তী সার প্রয়োগ ঃ

পুকুরের পানির সবচেয়ে উপযোগী রং হচ্ছে বাদামি সবুজ। পুকুরে পানির এ রং মূলত ভাসমান ফাইটো-প্লাংকটন ও জু-প্লাংকটনের উপস্থিতির কারণে হয়ে থাকে। সেজন্য নিয়মিত ভাবে পানিতে বিদ্যমান প্লাংকটনের অর্থাৎ প্রাকৃতিক খাদ্যের স্বল্পতা ও আধিক্য অনুমান পরীক্ষা করে পুকুরে সার প্রয়োগ করা বা বন্ধ রাখতে হবে উচিত।

প্রয়োগ মাত্রা ঃ

ফাইটো-প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য দু'টি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি হচ্ছে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস, যাদের সহজপ্রাপ্য উৎস হচ্ছে জৈব ও অজৈব সার। এ কারণে নার্সারি পুকুরে নিয়মিতভাবে গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, ইউরিয়া ও টিএসপি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
পুকুরে দৈনিক মাত্রায় মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ করাই উত্তম। তবে দৈনিক প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রয়োগ করা উচিত।

নিচের সারনীতে শতাংশ প্রতি দৈনিক মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ নমুনা দেখানো হলো-

সারের ধরণ	প্রয়োগ মাত্রা (শতাংশ প্রতি)
গোবর অথবা	২০০-২৫০ গ্রাম
কম্পোষ্ট	৩০০-৪০০গ্রাম
হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা	১৫০-২০০গ্রাম
ইউরিয়া	৪-৫ গ্রাম
টিএসপি	৩ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

গোবর ও টিএসপি সার একত্রে একটি বালতি বা ড্রামের মধ্যে তিনগুণ পানিতে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োগের পূর্বে গোবর ও টিএসপি মিশ্রিত পানির সাথে ইউরিয়া খুব ভালভাবে মিশিয়ে সূর্যালোকিত দিনের সকাল ১০-১১টায় পুকুরের পানিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের সতর্কতা ঃ

- পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক খাদ্যের স্বল্পতা ও আধিক্য পরীক্ষা করে সার প্রয়োগ করা বা বন্ধ রাখতে হবে।
- মেঘলা দিনে বা নিম্ন চাপের সময় সার প্রয়োগ অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে।
- ইউরিয়া সার বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখলে কার্যকারিতা কমে যায়।
- ঘোলা ও অম্লীয় পানিতে সারের কার্যকারিতা কম থাকে।

চুন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ঃ

পুকুরে চুন প্রয়োগের নিম্নবর্ণিত উপযোগীসমূহ পাওয়া যায়।

- মাটি ও পানির pH কে মাছ চাষের উপযোগী রাখে।
- পানিতে ক্ষারত্বের পরিমাণ ২০ মি. গ্রাম./লি. এর বেশি রাখতে সহায়তা করে।
- সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে।
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবী ও রোগজীবাণু দূর করে।
- পুকুর তলায় অবস্থিত জৈব পদার্থের পচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের পর্যাপ্ততা সৃষ্টি করে।
- চুনের ক্যালসিয়াম নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান।
- কাঁদায় আবদ্ধ ফসফরাস মুক্ত করে।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা ঃ

ক. হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে অর্থাৎ পানিকে নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে, ফলে প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় থাকে।

খ. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে ক্যালসিয়াম ও গুরুত্বপূর্ণ আয়ন সমূহ প্রদান করে থাকে। ক্যালসিয়াম ও সিলিকা জীবের দৈহিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করে থাকে।

গ. সালোক সংশ্লেষণের জন্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সরবরাহ বাড়ায়।
ঘ. প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্যে কাদায় আবদ্ধ ফসফরাসকে মুক্ত করে।
ঙ. জৈব পদার্থের পঁচন ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে, ফলে পানিতে পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।
চ. পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।
ছ. পানির ঘোলাত্ব দূর করে।
জ. সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে।

৬.২ মজুদপরবর্তী সাধারণ রোগ বালাই ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

রোগ হচ্ছে যে কোন প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মছের পোনাতেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে পুকুরে পোনা মারা যায়।

রোগের কারণ ঃ

জলজ পরিবেশের চাপ, রোগ জীবাণু এবং পোনার আভ্যন্তরীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেজন্য পোনার রোগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। মাছের রোগের চিহ্নিত কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি (পানির তাপমাত্রা, পঁচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি)
- অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব

- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহণ ও হ্যান্ডেলিং
- পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ ।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ছন্দহীনভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে
- শরীরের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় বা একেবারে বন্ধ করে দেয়
- পানির উপর ভেসে খাবি খাচ্ছি করে
- ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়
- দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে
- দেহে বিজল থাকে না, দেহ খসখসে হয়ে যায়
- পোনা পানিতে ডুবন্ত কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে
- চোখ ফুলে যায় বা বাইরের দিকে বের হয়ে আসে ।

পোনা ছাড়ার পর সার্বিক সতর্কতা ঃ

- রেণু ছাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে পুকুরে জাল টানা ঠিক নয়
- রেণু ভেসে উঠলে পানির ঝাপটা দিতে হবে । নতুন পানি যোগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ।
- পুকুরের পানির রং লালচে সবুজ এবং সেকিডিস্কেও দৃশ্যমানতা ২০-৩০ সে. মি. এর মধ্যে থাকা উচিত
- পোনার খাদ্য অত্যন্ত মিহি হতে হবে
- সূর্য ওঠার ৫-৬ ঘন্টা পর 'হররা' টানা উচিত । অক্সিজেন ঘাটতি থাকা অবস্থায় এবং পোনা ছাড়ার পর প্রথম ২-৩ দিন হররা টানা উচিত নয়
- মেঘলা দিনে সার, চুন ও খাদ্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে
- কুড়া ব্যবহার করলে তুষ পরিহার করে মিহি কুড়া ব্যবহার করতে হবে ।

আমাদের দেশে নার্সারিতে সচরাচর পোনা মাছে দেখা যায় এরূপ কিছু সাধারণ রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. লেজ ও পাখনা পচাঁ রোগ ঃ

এ রোগ সাধারণতঃ অ্যারোমোনাস ও মিক্সো ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে । সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মাছের পোনা রোগে আক্রান্ত থাকে ।

লক্ষণ ঃ

- পোনা দেহ ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে
- ত্বকের পিচ্ছিলতা কমে যায়
- প্রাথমিক পর্যায়ে লেজ ও পাখনায় লাল দাগ দেখা যায়
- পাখনার পর্দা ছিড়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়

প্রতিকার ঃ

- প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত পাখনা কেটে ফেলে ২.৫% লবণ পানিতে ২-৩ মিনিট গোসল
- পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) দ্রবণে ২-৩ বার গোসল

প্রতিরোধ ঃ

- শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ

২. ফুলকা পঁচা রোগ ঃ চাইনিজ কার্প ও দেশী কার্প মাছের পোনায় এ রোগ বেশি হতে দেখা যায়। ব্রাঙ্কিওমাইসিস নামক এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। জলাশয়ের তলদেশে অতিরিক্ত কাঁদা থাকলে ছত্রাকের সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ

- ফুলকায় গোল লাল দাগ দেখা যায়
- পরে ফুলকাটি সাদা হয়ে যায় ও ভেঙ্গে পড়ে

প্রতিকার

- প্রাথমিক অবস্থায় শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করে সম্ভব হলে ১০-২০% পানি পরিবর্তন
- ২-৩% লবণ জলে সহ্য ক্ষমতা পর্যন্ত গোসল

প্রতিরোধ ঃ

- পুকুর প্রস্তুতকালে অপ্রয়োজনীয় কাঁদা অপসারণ করলে ফুলকা পঁচা রোগ থেকে সাবধান থাকা যায়।

৩. সাদা দাগ রোগ ঃ

পোনার ঘনত্ব বেশি হলে এ রোগ বেশি সংক্রেমিত হয়

লক্ষণ ঃ

- পোনার ত্বক, লেজ ও পাখনায় সাদা দাগ
- ত্বকে সাদা সাদা গুটি
- দেহের পিচ্ছিলতা কমে যায়
- জোরে জোরে সাঁতার কাটতে থাকে
- মুখ হা করে পানির উপর ভাসতে থাকে

প্রতিকার ঃ

- ২% লবন দ্রবনে ১ মিনিট করে অন্ততঃ একনাগারে সাতদিন গোসল করাতে হবে

প্রতিরোধ ঃ

চুন ১ কেজি হারে প্রতি শতাংশে ২ বারে গুলিয়ে দিতে হবে।

পোনার মড়কের কারণ ঃ

পোনা যে সমস্ত কারনে মারা যেতে পারে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল

- রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্চিত মাছের প্রবেশ
- শামুক ও ঝিনুকের বিস্তার
- পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি
- ঘন সবুজ পানি
- পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি
- সাপ ও ব্যাঙের উপদ্রব
- পুকুরে ক্ষতিকর কীটের বিস্তার
- কম গভীর পুকুরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- জলজ আগাছার বিস্তার
- রেণু ছাড়ার পর নিম্নচাপের সৃষ্টি

৭. পোনা মাছ চাষের জন্য পোনার পরিচর্যা, নমুনায়ন করা ও পোনা মাছ চাষের খরচের হিসাব নিকাশ রেকর্ড বুকে সংরক্ষণ করা ঃ

৭.১ পোনার পরিচর্যা ঃ

পুকুরে পোনা ছাড়া হলেই চাষীর কাজ শেষ হয়ে যায় না। চাষীকে পুকুরে পোনা ছাড়ার পর হতে বাজারে বিক্রির উপযোগী বড় মাছ উৎপাদন পর্যন্ত নিয়মিত যে কাজগুলো করতে হবে তা হল।

মজুদ কৃত পোনা বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ ঃ

- পুকুরে পোনা মজুদের পর ১ সপ্তাহের মধ্যে যদি কোন পোনা মারা যায় তাহলে সেগুলো তুলে ফেলতে হবে এবং সমান সংখ্যক পোনা পুনঃ মজুদ করতে হবে।
- পোনা মজুদের পর সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত ভাবে করতে হবে
- পুকুরে পোনা মজুদের পরদিন হতে মজুদকৃত পোনার মোট ওজনের সাথে সংগতি রেখে প্রতিদিন সম্পূরক খাদ্য দিতে হবে। খৈল, গমের ভুসি, ফিসমিল, চাউলের কুঁড়া, খুদিপানা, নরম কচি ঘাস ইত্যাদি মাছ খেয়ে থাকে। গ্রাস কার্পের জন্য পুকুরে প্রতিদিন নরম কচি ঘাস এবং সরপুঁটির জন্য ক্ষুদিপানা সম্পূরক খাদ্য হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

৭.২ নমুনায়ন ঃ

- প্রতি মাসে একবার পুকুরে মজুদকৃত মাছের প্রজাতিভিত্তিক কমপক্ষে ১০% মাছ ধরে মোট মাছের ওজন বের করে খাবার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। নমুনায়নের ফলে মাছের দৈহিক বৃদ্ধি, রোগ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যাবে।

৭.৩ আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ ঃ

পোনা ছাড়ার ৪-৬ মাসের মধ্যে কিছু কিছু মাছ বাজারজাত উপযোগী হলে সেগুলো ধরে বিক্রির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিক্রিত মাছের সংখ্যার সমান-সংখ্যক এবং অতিরিক্ত হিসেবে ১০% বেশি ৪-৫ ইঞ্চি আকারের পোনা পরবর্তী ফসলের জন্য পুনঃমজুদ করা যেতে পারে।

৭.৪ পোনা মাছ চাষের হিসাব নিকাশ বা অর্থনীতি ঃ

পোনা চাষ একটি লাভজনক ব্যবসা। কারণ এর মাধ্যমে অল্প জায়গায় অল্প সময়ে অল্প পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে পোনা চাষে লাভ-লোকসানের পরিমাণ অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যেমন-

- চাষ পদ্ধতি
- প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজলভ্যতা ও মূল্য
- উৎপাদিত পোনার চাহিদা
- পোনা উৎপাদন ও বিক্রয় মৌসুম
- ব্যবস্থাপনা কৌশল
- চাষকৃত পোনার প্রজাতি ও আকার
- চাষীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
- প্রকৃতিগত অবস্থা

নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলতঃ চুন, বিষ, সার, খাদ্য, রেণু , শ্রমিকের মজুরী, পুকুর মেরামত ইত্যাদি খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। স্থান-কাল ভেদে উপরোক্ত দ্রব্যগুলোর দাম কম বেশি হতে পারে।

উল্লে খিত বিষয়াদি বিবেচনা করে নিচে মাছের পোনা চাষের সম্ভাব্য আয়-ব্যায়ের নমুন দেখানো হলো-

ক্রমিক নং	খরচের খাত/ উপকরণ/দ্রবাদি	পরিমাণ	দর/হার	মোট খরচ
১	পুকুর প্রস্তুতি ঃ			
	ক. পাড় মেরামত	-	-	--
	খ. ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার	-	-	--
	গ. রোটেনন বিষ ক্রয় ইত্যাদি	-	-	--
	ঘ. চুন ক্রয়, সার ক্রয়, ও অন্যান্য	-	-	--

২.	পোনার মূল্য ও পরিবহণ খরচ	-	-	--
৩.	খাদ্য ক্রয় ও পরিবহণ খরচ	-	-	--
৪.	ভিটামিন, লবন, ঔষুধ ক্রয় বাবদ	-	-	--
৫.	জাল টানা, নমুনায়ন করা, হররা টানা ইত্যাদি	-	-	--
৬.	চূড়ান্ত মাছ আহরণ খরচ	-	-	--
৭.	বাজারজাত করা ও পরিবহণ খরচ	-	-	--
				মোট খরচ =	

মোট মাছ ধরার পরিমাণ =
বিক্রী -------- টাকা প্রতি পিছ হিসাবে মোট বিক্রি (   ) টাকা
লাভ = মোট বিক্রি - মোট খরচ

৮. কার্পের ধানী পোনার চাষ

ক. পুকুর প্রস্তুতি ঃ
পুকুর প্রস্তুতি নিয়ম নার্সারীর মতোই। অর্থাৎ

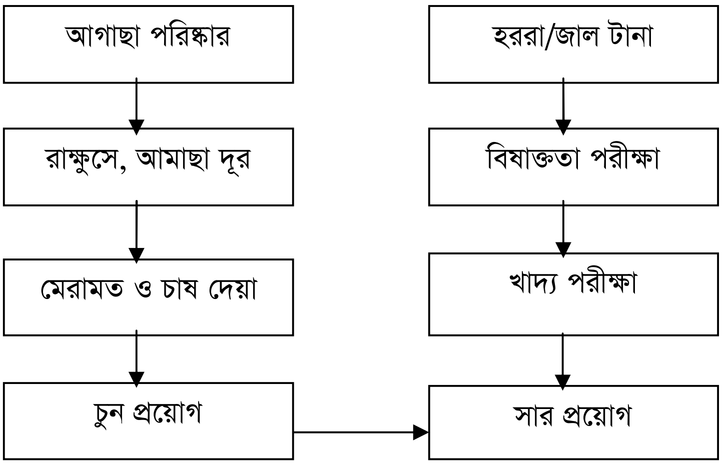

ধানীর পুকুরে কীটনাশক প্রয়োগের দরকার নেই। পুকুরে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার মাত্রা নার্সারী পুকুরের অনুরূপ হবে।

খ. ধানী পোনার মজুদ ঘনত্ব ও হারঃ
পুকুরে ধানী পোনা মজুদের পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখা উচিতঃ

১) একই পুকুরে এক জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ধানী একসাথে মজুদ করা যাবে।

মিশ্র চাষ করতে হলে এমন ভাবে জাত ঠিক করতে হবে, যাতে-

- খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে প্রতিযোগিতা না হয়, যেমনঃ কাতলা ও বিগহেড অথবা গ্রাস কার্প ও সরপুঁটি এক সাথে মজুদ না করা।
- বিক্রয়ের সময় পোনা সনাক্তকরণের কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়, যেমনঃ সিলভার কার্প ও বিগহেড।

২) অধিক ঘনত্বে (৮০০-১২০০টি/শতাংশ) ধানী মজুদ করা হলে চারা পোনা উৎপাদনে সময় বেশী লাগবে। অথবা মজুদের ৩০-৫০ দিনের মধ্যে পোনা আবার কাটাই/বিক্রয় শুরু করতে হবে।

৩) অল্প সময়ে (৪০-৬০ দিনে) বড় সাইজের পোনা (১০ সেমি) তৈরী করতে হলে কম ঘনত্বে ধানী মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে সারণী-১৪ এর সহায়তা নেয়া যায়।

সারণী-১৪ঃ ধানী পোনার মজুদ ঘনত্ব ও হার

প্রজাতি	শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্ব			
	পদ্ধতি-১	পদ্ধতি-২	পদ্ধতি-৩	পদ্ধতি-৪
কাতলা	২০০	-	২০০	১৯০
সিলভার কার্প	-	২৭০	১০০	৮০
রুই	-	১১০	১৪০	-
সরপুঁটি	-	-	-	১০০
গ্রাস কার্প	২০০	-	-	৮০
মিরর/কার্পিও	১৬০	১৮০	-	১১০
মৃগেল	-	-	১২০	-
মোট	৫৬০	৫৬০	৫৬০	৫৬০

গ. ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্তকরণঃ

পর্যবেক্ষণের বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
দেহের আকার	মোটা-তাজা	মাথা মোটা, দেহ চিকন
দেহের রং	ঝকঝকে উজ্জ্বল	ফ্যাকাশে
চলাফেরা	চটপটে	ধীর স্থির
পাত্রে আঙ্গুল দিলে	দ্রুত সরে যায়	আস্তে আস্তে সরে যায়
ত্বক	পিচ্ছিল	খসখসে

ঘ. ধানী পোনা পরিবহণ ও পুকুরে ছাড়াঃ

অক্সিজেন ব্যাগ, হান্ডি বা ব্যারেলে ধানী পরিবহণ করা যায়। পরিবহণ ঘনত্ব নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, শারীরিক অবস্থা, দূরত্ব এবং তাপমাত্রার উপর। অল্প দূরত্বে বেশী এবং বেশী দূরত্বে কম ঘনত্বে ধানী পরিবহণ করা উচিত। সাধারণতঃ প্রতি লিটার পানিতে (অক্সিজেন সহ) এর সংখখ্যা ৩০-৪০ টি হতে পারে (সংযোজনী-৩ এ বর্ণিত)।

সতর্কতাঃ পুকুরের পানির সাথে সহজনশীল না করে ধানী ছাড়া যাবে না। এ পর্যায়ে ২০-৩০ মিনিট সময় দেয়া উচিত।

ঙ. সার প্রয়োগঃ

নার্সারী পুকুরের মতো এখানেও নিয়মিত সার দিতে হবে। প্রয়োগ মাত্রা নার্সারী পুকুরের মতোই। পানির অবস্থা অনুযায়ী সার কম-বেশী হবে।

চ. খাদ্য প্রয়োগঃ

পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের মিহি কুড়া/গমের ভূষি ও খৈল ব্যবহার করা যায়। অধিক উৎপাদনের জন্যে এর সাথে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য (গবাদি পশুর রক্ত/ফিসমিল) দেখা যায়। খাদ্যে প্রোটিনের মান ২৫-৩০% হলে ভাল এবং প্রতিদিন পোনাকে তাদের দেহের ওজনের ৫-১০% হারে খাদ্য দেয়া উচিত। খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা নিম্নরূপ (সারণী-১৫)ঃ

সারণী-১৫ ঃ ধানীর পুকুরে শতাংশ প্রতি খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা

সময়কাল (দিন)	পরিমাণ গ্রাম/দিন	অনুপাত (%)			ক্ষুদিপানা গ্রাম/দিন
		খৈল	ভূষি	রক্ত/ফিসমিল	
১-১০	৪০-৪৫	৫০	৫০	-	-
১১-২০	৮০-১০০	৫০	৫০	-	১৫০
২১-৩৫	২০০	৫০	৩০	২০	১৫০

রক্ত/ফিসমিল ব্যয় সাধ্য। এগুলো সহজ প্রাপ্য না হলে শুধুমাত্র খৈল ও কুড়া (৫০ঃ৫০) ব্যবহার করা যাবে।

পুকুরে গ্রাস কার্পের ধানী মজুদ করা হলে নিয়মিত ক্ষুদিপানা প্রয়োগ করতে হয়। পুকুরে প্রয়োগের আগে ক্ষুদিপানা লবণ পানিতে ধুয়ে নেয়া উচিত। তা না হলে পোনার মধ্যে ক্ষত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

ছ. হররা টানাঃ

পোনা মজুদের ২-৩ দিন পর থেকে মাঝে মাঝে হররা টেনে দিলে পুকুরের তলদেশের খারাপ গ্যাস বের হয়ে যায়।

জ. নমুনা ও মূল্যায়ণঃ

২-৩ সপ্তাহ অন্তর মজুদকৃত ধানীর ঘনত্বের ৫-১০% নমুনায়ন করা উচিত। নমুনায়নের মাধ্যমে পোনার খাদ্য মাত্রার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায়। খাদ্য পরিবর্তন হার ৩ঃ১ এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এর হার বেড়ে গেলে বুঝতে হবে পরজীবী ও রোগের বিস্তার ঘটছে বা প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি আছে।

চারা পোনার লক্ষণ ঃ দেহ ঝকঝকে উজ্জ্বল, গায়ে কম বা বেশী বিজল থাকে না, ফুলকা লাল বর্ণের, প্রজাতি অনুযায়ী মাথা দেহের মধ্যে ভারসাম্যতা থাকে, দেহে কোন ধরণের বাজে দাগ থাকে না।

ঝ. সাধারণ রোগ-বালাইঃ

পোনার পুকুরে বিভিন্ন ধরণের এককোষী বাহ্যিক পরজীবী, উকুন, ফুলকা পচা, পাখনা পচা ইত্যাদি রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধে পুকুরে ১.২ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেমি পানি হারে ম্যালাকাইট গ্রীন এবং উকুন রোধে ১২ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেমি পানি হারে ডিপটারেক্স ব্যবহার করা যায়।

ঞ. পোনা ধরা ও বিক্রয়ঃ

পোনার আকার ৭-১০ সেমি হওয়ার পর কিছু পোনা ধরা ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ভাল। উল্লেখিত আকার আসতে ৪০-৬০ দিন লাগতে পারে। জাল দিয়ে পোনা ধরার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে পোনা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। ধরার পর পোনাগুলোকে কমপক্ষে ২-৩ ঘন্টা হাপার মধ্যে সহনশীল করে বিক্রয়/পরিবহণ করা উচিত।

পোনা ধরা বিক্রয়কালীন সতর্কতা

- যে কোন ধরণের পোনা সরাসরি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া বা গণনা করা উচিত নয়।
- বিক্রয়ের আগে পোনাগুলোকে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে ২-৩ গ্রাম/লিটার হারে লবণ দ্রবণ অথবা ১০ মিগ্রা/লিটার ম্যালাকাইট গ্রীন দ্রবণে পোনা পরিবহণ করা ভাল।

নার্সারী পুকুরে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

পর্যবেক্ষণের বিষয়	করণীয়
ভোরের দিকে পোনা পানির উপর ভেসে উঠলে (সূর্য উঠার পরও)	হররা টানার ব্যবস্থা করতে হবে।
রেণু ছাড়ার ৮-১০ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হলে এবং পোনা খাবি খেলে।	বৃষ্টির মধ্যে পুকুরে নেমে পাতিল দিয়ে ঢেউ সৃষ্টি করতে হবে।
রোদে পুকুরের পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে	২/৩ জায়গায় টোপাপানা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
দেহের তুলনায় মাথা মোটা হলে	পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধি কম। সার ও খাদ্য প্রয়োগ বাড়াতে হবে।
পানির রং ঘন সবুজ হয়ে গেলে।	সার/খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

ম্যালকাইট গ্রীণ দ্রবণ তৈরী পদ্ধতিঃ ১০০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ম্যালাকাইট গ্রীণ দিন। এ থেকে প্রতি ঘনমিটার পানিতে ০.৫ লিটার দ্রবণ দিলে ০.১ পিপিএম শক্তির দ্রবণ তৈরি হবে।

চারা পোনা উৎপাদনের সার সংক্ষেপ

- সূর্যালোকিত মাঝারী গভীর পুকুরে চারা পোনা উৎপাদন করা যাবে।
- ধানী পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরটি শুকিয়ে নিয়ে নার্সারী পুকুরের মতোই জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- নার্সারী পুকুরের মতো কীটনাশক প্রয়োগের দরকার নেই।
- পুকুরে ১.৫-২ সেমি আকারের ধানী মজুদ করা ভাল। অল্প সময়ে বড় আকারের চারা পোনা তৈরি করতে শতাংশ প্রতি ৫০০-৬০০ টি এর বেশী হওয়া উচিত নয়।
- ধানী মজুদের পর নিয়মিত সার ও খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়।

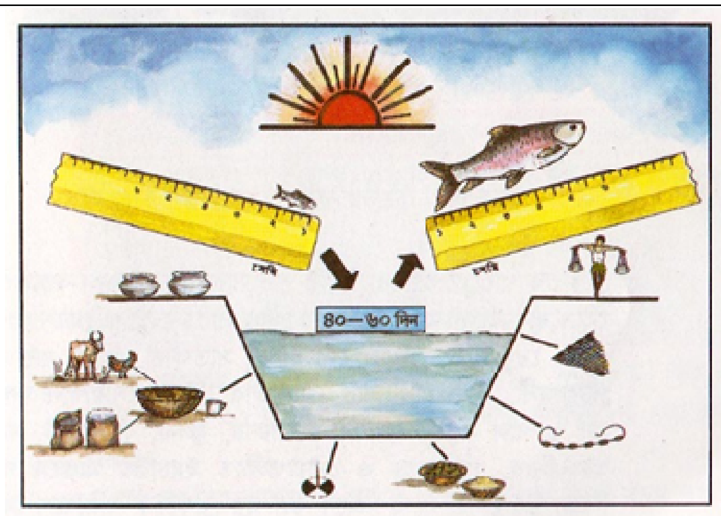

(চিত্র- ১৬ ঃ চারা পোনা উৎপাদনের সার সংক্ষেপ)